বকবক

মোঃ মুশফিকুর রহমান

(বিভিন্ন সময়ের আমার করা কিছু বকবক এখানে সংগ্রহ করে রেখেছি।)

পড়তে চাইলে নিচে স্ক্রল করুন।

সূচিপত্র

২০২৫:
- মেরুদণ্ডহীন ইন্টেরিম
- ক্ষমা করবেন ফয়জুল ভাই
- কি দেখার কথা কি দেখছি

২০২৪
- একাত্তর
- আওয়ামী দুঃশাসন
- ঐক্য
- আন্দোলন ভুল ছিলো?
- রেন্ডম কিছু নাকি পরিকল্পিত?
- শিক্ষক নেটওয়ার্ক
- আফসোস
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়!
- শিক্ষক
- সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
- tired
- ফরাজী হাসপাতাল
- মাজার ভাঙা
- বৃষ্টি, এরেস্ট হওয়ার রোমান্টিক ওয়েদার!
- জামায়াত ও নির্বাচন
- 'গুলি করি, মরে একটা, আহত হয় একটা...বাকিডি যায় না স্যার'
- Legacy of Excellence.
- সময়-জ্ঞান
- শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন
- রাজনৈতিক প্রতিহিংসা
- ধানমণ্ডি ৩২
- হকৃবির ভিসির পদত্যাগ দাবি
- এখন সময় ঘরে ফেরার
- ভুয়া সমন্বয়ক
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (মেয়াদ)
- আশা
- বিজয়!
- তারপর?
- ক্ষমতার দম্ভ
- ওরা নাকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী!
- ৯ দফা/১ দফা
- শিক্ষক
- আমার নিরাগ লাগে ভারি
- অপরাধটা কী করেছি?
- দায় কার?
- ইরফান ভূঁইয়া
- ১৮ জুলাই
- সাদা পোষাক
- ১৬ জুলাই
- রাজাকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা কই?
- বিসিএসের প্রশ্ন ফাঁস
- কোটা সংস্কার
- মঙ্গল শোভাযাত্রা
- কেপি ইমন
- পাতার কোয়ালিটি কেমন চাই?
- নিরপেক্ষ মিডিয়া!
- নির্বাচন প্রত্যাখ্যান

২০২৩
- রাজনটী - স্বকৃত নোমান
- অচিন গাছ
- ধর্ম নিয়ে রাজনীতি
- বৃষ্টি সর্বদা রোমান্টিক হয় না
- আল কায়দার খোঁজে - মহিউদ্দিন
- যত দোষ কবির সুমনের
- কালাপাহাড় ভ্রমণের বিস্তারিত
- মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি!
- মুখোশ
- সম্পর্ক

২০২২
- মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ
- গোড়ায় গলদ
- ঘুমকাতুরে প্রতি সন্ধ্যা
- স্টুডেন্ট হাফ পাস
- তুমি
- খেতে ভালো, মানুষের রক্ত
- তুমি
- ইন্দুবালা ভাতের হোটেল
- একজন কমলালেবু
- ট্রেন টু পাকিস্তান - খুশবন্ত সিং
- অক্ষয় মালবেরি - মণীন্দ্র গুপ্ত
- সরকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ব্যবসায়ীরা
- শাসন ব্যবস্থা সরকারের ফ্ল্যাক্সিবল বল
- বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস
- মৃত্যু
- বকবকঃ জাহানারা পারভীনের বই – ‘প্রফেট ও জিবরান’

২০২১
- করোনা ভাইরাসকে লেখা চিঠি
- আত্মহত্যা
- বিজ্ঞান বনাম অন্ধত্ব
- বুক রিভিউঃ পলাশী থেকে মুজিবনগর - নিখিল ভট্টাচার্য
- কবিতাঃ পৃথিবী সুস্থ হবে
- পরনির্ভরশীল আমরা!
- Optical Character Recognition
- একাডেমিক পড়াশোনা একটি গর্হিত কাজ
- চিরস্থায়ী হোক লটারির মাধ্যমে সরকারি স্কুলের ভর্তি
- বাংলা ভাষা ও বর্তমান প্রজন্ম

২০২০
- পরীক্ষায় প্রথম ফেইলের স্মৃতি
- শেখ কামাল ও শেখ রাসেলের তুলনায় শেখ জামালকে নিয়ে কম আলোচনা হয় কেন?
- ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তর
- স্বাধীনতার ঘোষক
- সিয়েরা লিওন এর দ্বিতীয় মাতৃভাষা বাংলা??
- উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা – হবিগঞ্জবাসী অবহেলিত
- নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নারীদের প্রতি অসম্মান
- প্রজাতন্ত্রের কথিত চাকররা বাংলাদেশে রাজা
- গল্পঃ জন্মলিখন
- বাংলাদেশের জন্ম ১৬ ডিসেম্বর না ২৬ মার্চ?
- করোনা সংক্রমিত ভবিষ্যৎ গল্প

২০১৯
- স্মৃতিময় স্কুল জীবন
- বুক রিভিউঃ ক্রাচের কর্নেল - শাহাদুজ্জামান
- বুক রিভিউঃ নন্দিত নরকে - হুমায়ূন আহমেদ
- কবিতাঃ দেবী

২০১৮
- কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ব্যক্তিগত মতামত
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঃ ৯৯৯ বা জরুরী সেবা
- আমার আলমা ম্যাটার হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

২০২৫

মেরুদণ্ডহীন ইন্টেরিম

কে বা কাদের সমালোচনার মুখে আপনারা পাঠ্যবই থেকে গ্রাফিতি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু সমালোচনার মুখে আপনারা চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। গরীবের উপর বোঝা চাপিয়ে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়াতে পারেন কিন্তু বড় লোকের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে পারেন না। রাজস্ব বাড়াতে উচ্চমধ্যবিত্তদের যে ৮৭ শতাংশ কোনো ধরনের আয়কর দেয় না তাদের উপর কঠোর হতে পারেন না।

হাজারো শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে, আকাশ সম জন সমর্থন নিয়ে যে সরকার গঠিত হয়েছিলো, সে সরকারের বিরুদ্ধে যদি জাতিকে স্লোগান দিতে হয় 'এক দফা এক দাবি, ইন্টেরিম তুই কবে যাবি' সেটা হবে জাতির জন্য দুর্ভাগ্য। মেরুদণ্ডহীন ইন্টেরিম যদি দ্রুত নিজের মেরুদণ্ড সোজা করতে না পারে তবে আমাদের অপ্রিয় হলেও সেদিন হয়তো নিকট ভবিষ্যতে দেখতে হতে পারে।

নিউ এইজে ইন্টেরিম প্রধান একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, উনারা আহত-নিহত সবার কাছে যেতে পারেন নি, বুরোক্রেসির কারণে। ছয় মাসেও যদি আপনারা বুরোক্রেসি ঠিক করতে না পারেন, বুরোক্রেসির দোহাই দিয়ে টপ মোস্ট প্রায়োরিটির একটা কাজ সমাপ্ত করতে না পারেন, তাহলে আপনাদের অমেরুদণ্ডহীন বলা ছাড়া উপায় নেই।

এটা শুধুমাত্র একটা উদাহরণ। এভাবে অসংখ্য কর্মকাণ্ডে, অসংখ্য জায়গায় বুজা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কম। আর এভাবে চলতে দেয়া যায় না, কারণ আপনারা ব্যর্থ হলে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে, জাতির সঙ্গে এটি হবে প্রহসন। একটি আধুনিক, উন্নত ও মানবিক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম সেটি স্বপ্নই থেকে যাবে।

বৈবিছাআ, রাজনৈতিক দল সহ অনেকে ফুয়েল দিলেও ইন্টেরিম একমাত্র ব্যর্থ হতে পারে শুধুমাত্র ইন্টেরিমের কারণেই। সাধারণ জনগণের উপর বোঝা কমান, তাঁদের ক্ষোভের কারণ হতে যাবেন না, আপনারা ব্যর্থ হতে পারেন না।

ক্ষমা করবেন ফয়জুল ভাই, ভালো থাকবেন।

Faizul Islam ভাই, আমাদের মুক্তাঞ্চল সাহিত্য উৎসবে এসেছিলেন হবিগঞ্জ। অত্যন্ত অমায়িক একজন মানুষ ছিলেন। ২০২২ সালের প্রথম কথোপকথনের একটা স্ক্রিনশট যুক্ত করলাম, এটি দেখলেই বুঝতে পারবেন উনি কতটা মিশুক ছিলেন।

কথাসাহিত্যিক, গল্পকার ফয়জুল ইসলাম অকালে চলে গেলেন ক্যানসারের সাথে লড়াই করে। শোকাহত, মর্মাহত!

উনার লেখায় সমৃদ্ধ মুক্তাঞ্চল সাহিত্য ম্যাগাজিন মুক্তপাতা উনার হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে সচিবালয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সচিবালয়ের মতো জায়গায় যেতে আমার মন চায় নি, উনার কাছে মুক্তপাতাও পৌঁছানো হয় নি। আমার এই খামখেয়ালিপনা এখন আমাকে প্যারা দিচ্ছে। তবে উনার সাথে প্রায়শই কথা হতো বিভিন্ন বিষয়ে।

ক্ষমা করবেন ফয়জুল ভাই, ভালো থাকবেন।

কি দেখার কথা কি দেখছি

১.

জুলাই অভ্যুত্থানের পরে অভ্যুত্থানের ম্যান্ডেট নিয়ে যে সরকার গঠিত হয়েছে সে সরকারের সবচেয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করার কথা ছিলো অভ্যুত্থানে আহতদের সুচিকিৎসা ও আহত-নিহত পরিবারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

উনারা কিছু হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সেই তথ্য আহতদের পরিবারগুলোই সবাই ভালোভাবে জানে না। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন নামকাওয়াস্তে কিছু প্রোগ্রাম করেছে, যেগুলো কোনোভাবেই যথেষ্ট ছিলো না।

দ্বিতীয় যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সেটা হলো বিচারের ব্যবস্থা করা। কমিশন গঠন, বিচার ব্যবস্থা সংস্কার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রভৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন কথা বললেও প্রায় অর্ধবছর চলে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে কোনো দৃশ্যমান সন্তোষজনক উদ্যোগ দেখা যায় নি। উলটো সারাদেশে এই ইস্যুতে হয়েছে মামলা বানিজ্য। ঢালাওভাবে শত শত মামলায় হাজার হাজার আসামি করা হয়েছে। আর এই মামলা বানিজ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে বিএনপি। আমার নিজের এলাকাতেই নিরপরাধ মানুষদের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অপরাধী অনেককে বাদ দেয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে যে দ্রুততা আমরা আশা করেছিলাম তার কিছুটাও পূরণ হয়নি।

অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয়া দল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আর অভ্যুত্থানের পরে গড়ে তোলা জাতীয় নাগরিক কমিটি নিজেদের দল ঘোচাতে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। অথচ আহতের চিকিৎসা, আহত-নিহতদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্বাসন এবং বিচারের দাবিতে যে পরিমাণ শক্তি ও সময় খরচ করা উচিত তাদের সেদিকে মনযোগ খুবই কম।

২.

সবাই চায় নিজেদের ক্রেডিট। একদল শাহবাগে স্লোগান দেয়, "মোল্লা (কাদের মোল্লা) তেরা খুনসে ইনকিলাব আয়া হে!"। বাল আসছে! মোল্লার অনুসারীরা গত ১৫ বছরে প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, স্ট্যাম্পবাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে 'ইউনিক নেতৃত্ব' দিয়েছেন তারেক রহমান"! বাল দিয়েছেন। ২৮ নভেম্বর তো দেখা গেল, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজে পুরো মাঠ ফাঁকা। নির্বাচনের সময়ে কেমন প্রতিরোধ করেছেন আপনারা তা সবাই জানে। "একটা মারি, একটাই মরে, বাকিডি যায় না", এই অভ্যুত্থানের মতো এমন প্রতিরোধ গত ১৫ বছরে বিএনপি দেখাতে পারে নি। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণ অভ্যুত্থান যেখানে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে হয়, সেখানে চব্বিশ ব্যতিক্রম। এবার ছিলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

৩.

শিক্ষাজীবনে সবাই খুব সৎ, ন্যায়পরায়ণ হতে চায়। কিন্তু সে ব্যক্তিটিই সিস্টেমের কারণে পরবর্তীতে হয় চরম অসাধু, দূর্নীতিবাজ, অসৎ। আমরা সেই সিস্টেমকে সংস্কার করতে চেয়েছিলাম, এমন একটি সিস্টেম চেয়েছিলাম যেখানে সবাই সৎ, সুনাগরিক হতে বাধ্য থাকে সিস্টেমের কারণেই।

আসল কাজ হয়ে যাওয়ার পর সবাই নিজেদের আখের ঘোচাতে ব্যস্ত। বিএনপি চায় দ্রুত নির্বাচন, সরকারও সেখানে নতজানু। কিন্তু আওয়ামিলীগের পরে বিএনপির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় নি। এই সরকারের প্রতি আপামর জনতার ছিলো প্রবল আশা, স্বপ্ন।

৪.

অভ্যুত্থানকালীন সময়ে আমরা যে ট্রমার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিলো তাদের ছাত্রদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করা, কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা। অথচ আমরা দেখেছি নর্দান সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়

খেলার পর প্রথম দিন থেকেই একাডেমিক পরীক্ষা নেয়া শুরু করেছে! অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও ছিলো উদাসীন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক আহত-নিহতদের তালিকা পর্যন্ত প্রস্তত করা হয় নি।
যেখানে এই সরকার, বৈবিছাআ, জানাক কেউই আহতের চিকিৎসা, আহত-নিহতদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্বাসন এবং বিচারের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক নয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষার্থীদের কথা ভাবে না, সেখানে যারা জীবিত আছে তাদের নিরাপত্তার বিধান তারা করবে এই আশা করাটা বোকামি। নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরা নিশ্চিত করুন, খুন হয়ে গেলেও হয়তো আপনার পরিবার ও জানবে না কেন তাদের বুক খালি হলো। আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাতো এই সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী, যাদের জীবিত থাকা কিংবা মরে যাওয়া নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।
শুভ সময়।

২০২৪

একাত্তর

একাত্তর প্রশ্নে আওয়ামীলীগের একপাক্ষিক বক্তব্য থেকে বের হয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেন্সে দেখার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আপনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন না কেন জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চ, ইন্দিরা গান্ধী তথা ভারতের সহযোগিতা সহ অনেকগুলো বিষয় অস্বীকার করতে পারবেন না। যেমন মুছে ফেলতে পারবেন না এদেশে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব' 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো। আপনার অপ্রিয় হলেও এগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য। যেমনটা সত্য মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের বিরোধিতা। যেমনটা সত্য রাজাকারদের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা। ন্যারেটিভ, কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরির শত শত প্রচেষ্টার মধ্যেও এগুলোর ভিত্তি আছে বলেই টিকে আছে।
ঠিক তেমনিভাবে যতই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হাজির করেন না কেন, চব্বিশের প্রশ্নে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের দুঃশাসন, গণতন্ত্র হত্যা, গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, গুম, খুন, নির্যাতন, অর্থ পাচার, ভিন্নমত দমন, সর্বশেষ হাজার ছাত্র জনতা হত্যা কোনোটিই অস্বীকার করতে পারবেন না। কোনো বড় দেশের কারণে নয়, এদেশের আপামর সাধারণ জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে শেখ হাসিনার দেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে, যা আপনি কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলেও আদতে টিকবে না। দেশ যে কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিলো ২০১৪ থেকে, সেটি দেশের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চব্বিশে জনগণ নিজেরাই সরিয়েছে।
একাত্তরের মূল চালিকা শক্তি যেমন ছিলো সাধারণ জনতা, চব্বিশেও তাই। একাত্তরে যেমন মানুষ অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা চেয়েছিলো, চব্বিশেও তাই।
একাত্তর আর চব্বিশকে মুখোমুখি করার চেষ্টা একটি ব্যর্থ অপচেষ্টা। একাত্তরকে নিয়ে সাময়িক জল ঘোলা করতে পারেন, কিন্তু সময় ও স্রোতের সাথে সেই ঘোলা জল সরে গিয়ে আবার স্পষ্ট জল আপনা আপনিই দেখা যাবে। একাত্তরের তুলনা একাত্তর নিজেই। একাত্তরের সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তবুও দেখেন ন্যারেটিভ আর কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরির খেলায় কিছু করতে পারেন কি না, আমার মনে হয় না বেশি সুবিধা করতে পারবেন।
মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

আওয়ামী দুঃশাসন, একজন হিন্দু (!) মহিলা নিম্নমান সহকারী এবং একজন মুসলিম (!) মহিলা সচিব...

উনি শ্যামলী বণিক। উনি ৩৪ বছর ধরে লালমনিরহাট পৌরসভায় নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে চাকরি করেন। তিন মেয়ে, স্বামীসহ উনি লালমনিরহাটেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

২০২৩ সালে উনাকে হঠাৎ বদলি করা হয় হারাগাছ পৌরসভায়, যেখান থেকে উনার বাসায় আসতে যেতে বাসে ৩+৩=৬ ঘন্টা সময় লাগে। হারাগাছ পৌরসভার কোনো এক লোক লালমনিরহাটের তৎকালীন মেয়রের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে নিজে লালমনিরহাট আসে এবং উনাকে হারাগাছ পাঠায়। একজন ৫৬ বছর বয়সী মহিলার পক্ষে নিজের পরিবার ছেড়ে হারাগাছে নতুন করে বসবাস করাটা যেমন অসম্ভব ছিলো তেমনি এই বয়সে দিন ৬ ঘন্টা জার্নি করে অফিস করাটাও ছিলো কষ্টকর। চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পেনশনের আগমুহুর্তে চাকরিটা ছেড়ে দেয়াও সম্ভব ছিলো না।

তাই এই ৫৬ বছর বয়সী মহিলা কষ্টকর হলেও প্রতিদিন ৬ ঘন্টা জার্নি করে গত ১ বছর যাবত চাকরি করছিলেন।

উনাকে বলা হয়েছিলো, আপনার বয়স হয়েছে, আপনার বেতন থেকে ১০ হাজার মাস্টাররোলের ছেলেকে দিবেন আপনার কাজ করবে, আপনি বাসায় বসে থাকবেন। উনি রাজি হননি।

উনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নন। উনি মেয়র, এমপির বাসা, সচিবালয় অনেক জায়গায় ঘুরতে থাকেন, বদলির জন্য, যেন চাকরি জীবনের শেষ সময়ে এই বয়সে যেন দিন ৬ ঘন্টা জার্নি করতে না হয়। কিন্তু মেয়র, এমপি, সচিবালয় কোথাও কোনো লাভ হয় নি। কেউ ২০ হাজার, কেউ ৫০ হাজার, কেউ ১ লাখ টাকা চায় বদলির জন্য।

উনার ভাষ্য ছিলো, আমি জীবনে এক পয়সা অন্যায়ভাবে উপার্জন করি নি, কাউকে অন্যায়ভাবে কোনো টাকাও দিব না।

ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর তিনি পুণরায় সচিবালয়ে যায়। সালমা সিদ্দিক নামক একজন সচিব উনার বিস্তারিত শুনে উনাকে যাবতীয় সহযোগিতা করেন। অবশেষে গত ৩ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে উনাকে পুণরায় লালমনিরহাট পৌরসভায় বদলির অফিস আদেশ দেয়া হয়।

এবার কত লাগলো? ০ টাকা। অবশেষে উনি আজ (৯ ডিসেম্বর) আবার সসম্মানে লালমনিরহাট পৌরসভায় যোগদান করেন।

এই যে ঘুষ না দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এতোদিন যাবত ধৈর্য ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এটা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ঐক্য

আমরা UIU এবং আমাদের পাশের DIU আন্দোলনের প্রতিদিন একসাথে ছিলাম। একসাথে ছাত্রলীগ প্রতিহত করেছি, একসাথে পুলিশের গুলি খেয়েছি।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যখন পুলিশ গুলি করলো তখন ঐপাশ থেকে ইস্ট ওয়েস্ট এইপাশ থেকে UIU, DIU, NSU, IUB, AIUB, UITS সবাই একসাথে এগিয়ে গিয়েছি। গুলি খেয়েছি, তবুও রাস্তা ছাড়ি নি। আমাদের এই ঐক্য, এটা পরবর্তীতে দেশের অনেক সমীকরণ পালটে দেয়।

Just a gentle reminder for everyone.

হাসিনার পতন আন্দোলন ভুল ছিলো?

শুনেন, একটা স্পষ্ট কথা বলি
আমার কখনোই মনে হয় নাই, শেখ হাসিনার পতন আন্দোলন ভুল ছিলো। পরিচিত অনেক ভাই বন্ধু সরাসরিই আমাকে অনেক বার বলেছেন যে, আমি নিজেও নাকি প্রকাশ্যে বলতে পারি না, কিন্তু মনে মনে ঠিকই মনে করি যে শেখ হাসিনার পতন ঠিক হয় নাই।
চোখের সামনে রক্ত বন্যা দেখার পর, এমনটা মনে হওয়ার মতো কোনো কারণই আমার সামনে নাই, একটা সরকার হাজারো লাশের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কোনো যুক্তিতেই না।
একই ভাবে বর্তমানে যারা আছে, ভবিষ্যতে যারা আসবে, সবার জন্যই একই জিনিস প্রযোজ্য। তারা যদি ভুল করে, তখন তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ চলবে। এখানে নতজানু নীতি অবলম্বন করি নি, করব না।

এটি কি রেন্ডম কিছু নাকি পরিকল্পিত?

৫ তারিখের পর সোহেল তাজ একের পর এক গণমাধ্যমে যাচ্ছেন, ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, এবং একই ধরণের কথাবার্তা বলছেন। উনি কাজ করার সুযোগ পান নাই, শেখ হাসিনা উনাকে গান শুনিয়েছেন, বিডিআর বিদ্রোহের বিষয়টি সরাসরি শেখ হাসিনা দেখেছেন, শেখ হাসিনা দল ও দেশের সাথে বেঈমানি করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।
ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন, প্রতিটি জায়গায় উনি এক কথাগুলোই বার বার পুনরাবৃত্তি করছেন। মানবজমিন, ইত্তেফাক, TBS, কালের কণ্ঠ প্রতিটি জায়গায় প্রশ্নকর্তারা একই টাইপ প্রশ্ন করেছেন, উনার উত্তরগুলোও ছিলো একই টেমপ্লেটের!

শিক্ষক নেটওয়ার্ক

আপনি আপনারা যখন এই সরকারের পদলেহনে ব্যস্ত ছিলেন, অথবা নীরব ভূমিকা পালন করছিলেন তখন এই শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকরাই বুক চিতিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনাদের সাথে উনাদের পার্থক্য এইজায়গাতেই, মেরুদণ্ড। শিক্ষক নেটওয়ার্কের এই সংগ্রাম অনেকদিনের, খোঁজ নিয়ে দেইখেন স্বৈরাচারের ভরা মৌসুমেও উনারা কিভাবে মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। গানের অঙ্গণে যেমন র‍্যাপ আর্টিস্টরা আন্দোলনের সময়ে অন্য সকল শিল্পীদের দায়মুক্তির সুযোগ দিয়েছেন তেমনি কখনো কখনো মনে হয় ঢাকায় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আর জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা না থাকলে শিক্ষক সমাজের সম্মান, পাঠদানের মোরাল কারেজ কিছুই থাকত না এই স্বৈরাচার পতনের পর। উনারা শিক্ষক সমাজকে অনেকটা দায়মুক্তি দিয়েছেন।
রাস্তাঘাটে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিজেদের নিরাপত্তাশঙ্কায় ভুগতাম, কিন্তু যখনই যেই কর্মসূচিতে দেখতাম শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা উপস্থিত আছেন, তখন সাহস কয়েকগুণ বেড়ে যেত, অন্তত এটা ভাবতাম যে উনাদের কাছ থেকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। আপনারা আমার ভিডিওতে দেখে থাকবেন হাইকোর্টের সামনে কিভাবে শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের সাথে নিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে নিয়ে এসেছিলাম আমরা।

তখন এই শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকরাই পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, শিক্ষার্থীকে ছেড়ে দেন, নয়তো আমাদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান।

.

আগের দিন রাত্রে সামিনা লুৎফা ম্যামের ভিডিওটি দেখেছিলাম যেখানে পুলিশ উনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে না দেয়ায় তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে কি না।

পরের দিন পুলিশ আমাদের নতুন বাজার যেতে না দেয়ায় আমি একইভাবে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে নতুন বাজারে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে কি না। আন্দোলনের সময়ে উনারা আমাদের কতটা প্রভাবিত করেছিলেন তার ছোট্ট একটি প্রমাণ এটি।

আফসোস

নিজের শহরে, নিজের মানুষজন দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন খুলে হাসার, প্রাণ খুলে বাঁচার দিনগুলো। নিজের পটেনশিলায়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার, ব্যস্ত দিন, তবুও প্রতিটি সময় ছিলো কত রঙ্গিন! ছিলো না হতাশাগ্রস্থ দিন, নিজের পটেনশিয়াল ব্যবহার করতে না পারার আফসোস কিংবা নিদ্রাহীন রাত, যেটা আমার বর্তমানের নিত্যসঙ্গী। সবসময় মুখে হাসি গেলে থাকা দিনগুলোতে কিসের বিনিময়ে ফেরত যাওয়া যাবে? আছে কি এমন কিছু? যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে আমি ফিরতে চাই...

আন্দোলন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

দেশতো স্বাধীন, নিজের অভিজ্ঞতার সত্য কথাগুলো বলতে পারি? হয়তো এই পোস্টের পর আমার ভার্সিটি লাইফ পূর্বের মতো স্মুথ না ও থাকতে পারে, বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার উপর চাপ আসতে পারে, তবুও বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে যেহেতু কথা হচ্ছে এবং অনেকে ভুল ইনফরমেশনও ছড়াচ্ছে তাই আমার মনে হয় এখন ঐদিনের আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করা উচিত।

.

যখনই আমাদের যে শিক্ষার্থী গ্রেফতারের খবর পেয়েছি, নিজে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে সহযোগিতা করার। যেদিন অরণ্য ও জয় বসুন্ধরার ৮ নাম্বার গেইট থেকে ভাটারা থানায় গ্রেফতার হলো ঐদিন অরণ্যর ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও জয়ের ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। তখন জয়ের ফ্যামিলির কন্টাক্ট জোগাড় করার জন্য আমি মাহতাব স্যারকে মেসেজ দেই, স্যার বলেন যে ইউক্যামে ফ্যামিলি কন্টাক্ট পাওয়া যায় না, আমি যেন এডমিশন ডিপার্টমেন্টের মাহবুব স্যার অথবা এক্সাম কন্ট্রোলার নার্গিস ম্যামের সাথে কথা বলি। স্যার আমাকে উনাদের নাম্বারও দেন।

.

আমি এডমিশন ডিপার্টমেন্টের মাহবুব স্যারকে প্রথমে কল দেই। স্যার আন্তরিকতার সাথে আমার সাথে কথা বলেন, অন্য গ্রেফতারকৃত স্টুডেন্টদের খোজ খবর ও নেন। স্যার জানান যে এই এক্সেস স্যারের কাছেও নেই, শুধুমাত্র এক্সাম কন্ট্রোলার নার্গিস ম্যামের কাছে রয়েছে। উনি নার্গিস ম্যামের সাথে কথা বলবেন, আমি যেন নার্গিস ম্যামকে কল দেই।

.

নার্গিস ম্যামকে কল দেয়ার পর ম্যাম বলেন যে এইভাবে কারো ফ্যামিলির নাম্বার দেয়ার নিয়ম নেই, আমি যেন অফিসিয়ালি রেজিস্ট্রার স্যারকে মেইল করি। কিন্তু ঐ সময় আমি নিজেই বাসা থেকে পলাত ছিলাম, পুরাণ ঢাকায় একটি মেয়েদের মেসে অবস্থান করছিলাম। আমার পক্ষে অফিসিয়ালি মেইল করা সম্ভব হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাহতাব স্যার জয়ের খালার নাম্বার দিলেন। আমি যে নাম্বার পেয়েছি এটাও আমি আবার নার্গিস ম্যাম ও মাহবুব স্যারকে কল দিয়ে ইনফর্ম করি। কেউ যেন মিসলিড না হয় সেজন্য আমি নার্গিস ম্যামের সাথের কল রেকর্ডটি পোস্টের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছি।

.

ওদের গ্রেফতার হওয়া নিয়ে eds ডিপার্টমেন্টের একজন ম্যাম এবং eee ডিপার্টমেন্টের একজন স্যারের সাথে যোগাযোগ হয়। উল্লেখ্য উনাদের সাথে আমার এইদিনের পূর্বে কখনো কথা হয় নি। ভাটারা থানায় আটককৃত আমাদের দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনার জন্য এই দুইজন শিক্ষক আমার সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছেন।

স্যারের ফ্রেন্ডের বাবা পূর্বে ভাটারা থানার ওসি ছিলেন, উনি সেই আংকেলকে দিয়ে থানায় যোগাযোগ করেন। ম্যাম উনার ফ্রেন্ড পুলিশের জনৈক এসআই এর মাধ্যমেও থানায় কথা বলান।

.

সকালে দুই শিক্ষার্থীদের চালান দেয়ার পূর্বেই তাদের যেন মুক্ত করা যায়, এজন্য আমি উনাদের রিকুয়েষ্ট করি উনারা যেন প্রয়োজনে সকাল ৮ টায় থানায় গিয়ে ওদেরকে মুক্ত করে আনেন। উক্ত দুই ফ্যাকাল্টি এই বিষয়েও পজিটিভ ছিলেন এবং উনারা থানায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন, উনারা ভার্সিটির অন্য সকল ফ্যাকাল্টিদের সাথেও যোগাযোগ করে যাচ্ছিলেন এই বিষয়ে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়।

আমাদের অন্য শিক্ষার্থীরা ফাহিম হাফিজ স্যার, সনেট স্যারের সাথেও যোগাযোগ করেন এবং উনারাও আন্তরিক ছিলেন তাদের মুক্ত করার ব্যাপারে। মাহতাব স্যারের কথাতো আপনারা সবাই জানেন। ফাহিম স্যার, সনেট স্যার আর আরো অনেক সম্মানিত ফ্যাকাল্টিরা প্রথম থেকেই আমাদের সাথে ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন।

.

পরবর্তীতে সকাল ৮ টায় আর থানায় যেতে হয় নি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাত ১.৪৫ মিনিটে প্রথমে জয়কে ও পরবর্তীতে অরণ্যকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

.

রুদ্রর বাবার নার্গিস ম্যামকে নিয়ে একটি অভিযোগ ছিলো, যেটির অডিও রেকর্ড (সংগ্রহীত) আমি পোস্টের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছি যেন আপনারা দুই পক্ষের বক্তব্য শুনতে পারেন।

.

এর বাইরেও ঐ অস্থির সময়ে আরো অনেকে অনেক ভাবে চেষ্টা করে থাকতে পারেন, উনাদের অবদানকেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। আমি শুধু আমি যতটুকু জানি সেটি বললাম।

আন্দোলনের সময় আমাদের অনেক মেসেঞ্জার গ্রুপ ছিলো ঐ গ্রুপগুলোর বিশেষ করে Question Archive এবং তমদ্দুন মজলিস এই দুই গ্রুপের মেম্বার (সাধারণ শিক্ষার্থী) অনেকেই এসময় অনেক এক্টিভ ছিলেন, ফাহিম স্যার সহ অন্যান্য ফ্যাকাল্টিদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন, থানার ওসির নাম্বার কালেক্ট করা সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গেস্টরুম কালচার এখনো বজায় রাখলেন!

অথচ ঢাবিকে আমরা আমাদের হৃদয়ে রাখতাম, ঢাবিকে ভাবতাম দেশের প্রাণ, সবকিছুর কেন্দ্র। ঢাবি বলে দিলো কিসের কেন্দ্র, কিসের প্রাণ, ওদের "চান্স পেয়ে দেখানো" ছাত্ররা ব্যাতিত সবাই বহিরাগত, কেউ ঢুকতে পারবে না। মনঃক্ষুণ্ন হলেও মনে হয়েছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এমন সিদ্ধান্ত নিতেই পারে, হয়ত ওরা নিজেদের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থান সব ভুলে গিয়েছে, যেতেই পারে, তাই এমন সিদ্ধান্ত। কিন্তু বহিরাগত হয়ে গেলে কি মাইরা ফেলবে? হল খালি করলেন, রাজনীতিমুক্ত করলেন, ছাত্রলীগ নাই এখন, কিন্তু পরিবর্তন কি হলো? নিজেরাই ছাত্রলীগ হয়ে গেলেন, গেস্টরুম কালচার এখনো বজায় রাখলেন!

.

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন পুলিশ বিজিবি হল খালি করার জন্য হামলা করলো তখন "আপনারা সবাই ঢাবি আসেন", " ঢাকাবাসী বাচান প্লিজ" টাইপের পোস্ট দেখে আমাদের সহপাঠী রুদ্র বোকার মতো গিয়েছিলো ঢাবিকে বাঁচাতে। ঢাবিতে প্রবেশের সময় রুদ্রকে গ্রেফতার করে নীলক্ষেত থানার পুলিশ, ৩ লাখ টাকা ক্ষয়ক্ষতির সাথে ১৫ হাজার টাকার সাইকেল চুরির মামলা দেয়, পরবর্তীতে কোর্টে তুলে ৩ দিনের রিমান্ড।

২. ঢাবিকে বাঁচাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোকা শিক্ষার্থীরা ১৮ তারিখ 'মুক্তি মার্চ' কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্ল্যান ছিলো প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে সবাই একসাথে ঢাবি অভিমুখে মার্চ করবো। কিন্তু সে কর্মসূচি সফল হয় নি, যাত্রাপথে হাজার হাজার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। অনেকে আহত হয়, অনেকে শহীদ হয়।

ঢাবিকে বাঁচাতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে ৩ দিনের রিমান্ড ও অনেকদিন জেলে থাকা বোকা রুদ্র সহ মুক্তি মার্চ করতে যাওয়া হাজারো বোকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে পেলো ঢাবি নোটিশ দিয়েছে, তোমার আইডিকার্ড নেই, তুমি যাও ফুটো এখান থেকে! আর আজকে জাতি দেখলো ঢাবির কিছু শিক্ষার্থীদের অন্ধকার রুপ।

ঢাবির ভাই বন্ধু যারা আছেন, তাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ, আপনারা বহিরাগত ঢুকতে না দেয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করেন, কিন্তু আজকের যে ঘটনা ঘটলো এটার প্রতিবাদ করেন, এটার দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে, এমন ঘটনা যেন ভবিষ্যতে কখনো পুনরাবৃত্তি না হয় সেটি নিশ্চত করার জন্য যা করা প্রয়োজন তা করেন। ইতিমধ্যেই আপনারা একাডেমিক ও গবেষণার দিক থেকে দেশে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছেন, এমন ঘটনা চলতে থাকলে সব জায়গা থেকেই নিজেদের প্রথম অবস্থান থেকে নিচে যেতে দেখতে থাকবেন শুধু, কিছুই করার থাকবে না।

এই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট সবচেয়ে বেশি ক্যারি করার উচিত ছিলো ঢাবির শিক্ষার্থীদের!

শিক্ষক

চারদিকে শিক্ষকদের নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টিরা আমাদের অনেক হেল্প করসেন, তাদের নিয়ে কথা বলাটাও জরুরি বলে মনে করি।

১৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগ হামলা করে, মেয়েদের উপর বিভৎস হামলার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। প্রতিবাদে আমরা ক্লাস বয়কট করে পূর্বের দিনের মতোই রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নেই। তো আমি কোর্সের গ্রুপে একটি পোল ক্রিয়েট করি কারা কারা ক্লাস বয়কটের পক্ষে আছে সেটি দেখার জন্য। কিন্তু সেখানে মাত্র ৩ জন ভোট দেয় ক্লাস বয়কটের পক্ষে, বাকিরা হ্যাঁ বা না কিছুই না জানিয়ে নিরবতা পালন করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বয়কট নিয়ে সবসময়ই দ্বিধায় থাকে। তখন আমি স্যারকে মেনশন দেই এবং ত্রাতার ভূমিকায় স্যার আবির্ভূত হয়ে নিচের মেসেজটি দেন। “Announcing not as a faculty: Of

course class and CT is cancelled, that is a no brainer. We will figure a way out for evaluation later. I want everyone of you to join your peers and make the movement successful”

উল্লেখ্য স্যার প্রথম শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিয়েছেন, এবং আমাদের এই কোর্সটা দিয়েই সম্ভবত স্যারের শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। যেদিন অনেক শিক্ষার্থীরা অন্য অনেক কোর্সের ক্লাস করে, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবীন শিক্ষক হিসেবে স্যার যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেজন্য স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সরকার পতন না হলে, এই মেসেজের জন্য হয়তো স্যারকে অনেক সমস্যায় পড়তে হতো, কিন্তু স্যার ন্যায়ের পক্ষে থাকতে পিছপা হন নাই। স্যার পরবর্তীতেও হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছেন।

পরবর্তীতে পাবলিক, প্রাইভেট অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকরাও আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। কিন্তু Tahmid Mahin স্যার ভার্সিটির নবীন শিক্ষক হয়েও যেসময় সমর্থন দিয়েছেন, ঐ সময়টা খেয়াল করবেন, ১৫ জুলাই, অনেক আগে।

ধন্যবাদ স্যার।

সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সময়টা খেয়াল করবেন, ১৭ তারিখে ঢাবিতে গায়েবানা জানাজার পর কফিন মিছিলে পুলিশ গুলি করে। ঐদিন রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ বিজিবি সম্মিলিতভাবে হামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় খালি করে ফেলে, অর্থাৎ আন্দোলন শেষ।

কিন্তু পরদিন ১৮ তারিখ সরকারকে চমকে দিয়ে ঢাকা দখলে নেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পুলিশ বিনা উস্কানিতে অযথাই আমাদের উপর রামপুরা, উত্তরা সহ বিভিন্ন জায়গায় নির্বিচারে গুলি করে। শত শত শিক্ষার্থী আহত হয়, অনেকে নিজের বুকের তাজা রক্ত রাজপথে ঢেলে দেয়, কিন্তু কেউ পালিয়ে যায় নি, রাস্তা দখলে রেখেছে, বিশাল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। মধ্যবাড্ডায় আমাদের ইউআইইউ এর শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। চোখের সামনে শত শত আহত শিক্ষার্থী, চোখের সামনে ইম্পেরিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থী শহীদ হয় পুলিশের গুলিতে। রামপুরায় পুলিশের গুলি পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, এতো বেশি হিংস্র ও আক্রমণাত্মক ছিলো ওরা। তারপর পুলিশকে মারতে মারতে আমরা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির উপরে নিয়ে তুলি, নিচ দিয়ে গ্রাউন্ড সাপোর্ট হিসেবে বিজিবি এসেছিলো, কিন্তু বিজিবি দিয়ে তেমন সুবিধা হয় নি। যে পুলিশ ১০ মিনিট আগে আমাদের বুকে গুলি করেছে সে পুলিশ গুলি শেষ হওয়ার পর আমাদের প্রতিরোধের মুখে ছাদে উঠে ছাদ থেকে আমাদের নিকট হাত জোর করে ক্ষমা চায়, স্যালুট দেয়। খেয়াল করবেন, পুলিশ ছাদে উঠে যাওয়ার পর, গুলি বন্ধ করার পর আমরা কিন্তু ছাদে গিয়ে আর পুলিশকে মারি নি। তারপর এয়ারফোর্স ও র‍্যাবের দুইটি হেলিকপ্টারে প্রতিবারে ৫/৬ জন করে অবশেষে ওরা ছাদ থেকে পালিয়ে যায়। একইভাবে উত্তরা সহ ঢাকার অনেক জায়গায় ঐদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলে, সাথে যোগ দেয় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা। ফলস্বরূপ ১৮ তারিখেই সরকার ঘোষণা দেয় ওরা আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে, আজই বসতে চায় আমাদের সাথে, যদিও আমরা তা প্রত্যাখান করি। তারপর কারফিউ ঘোষণা করে।

ছবিগুলো ১৮ তারিখে আমার ফোনে ক্যাপচার করা হলেও এই প্রথম আপলোড দিলাম। ১৮ তারিখের কথা এখানে বললাম, ১৬ তারিখের একটি ভিডিও এই পোস্টের পূর্বের পোস্টে আমার আইডিতে আপলোড করেছি, সেখানে দেখতে পারবেন কেমন অংশগ্রহণ ছিলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

১৭ তারিখ রাত্রে সরকার যখন ঢাবি ও জাবি খালি করে ভেবেছিলো ওরা আন্দোলন দমিয়ে ফেলেছে তখন ১৮ তারিখ তাদের কফিনে পেরেক ঠুকে ঢাকার সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

নিচের সবগুলো ছবি ১৮ তারিখের, যেদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বুক চিতিয়ে না দাড়ালে হয়তো আন্দোলন অনেকটাই ব্যর্থ হতো।

tired

The weight of my responsibilities is growing, pulling me in many directions. As I struggle to keep everything in balance, it feels like the more I try, the more I'm losing my true self. It seems like life is asking me to be stronger and more resilient, but deep down, I know I'm not that kind of person. I am just too tired right now.

ফরাজী হাসপাতাল

আন্দোলন চলাকালীন (১৬ জুলাই) ছাত্রলীগের হামলায় আহত, চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া আমাদের একজন শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের কাছে তুলে দেয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শুনতে আজ আমরা United International University এর শিক্ষার্থীরা ফরাজি হাসপাতালে যাই।
সেখানে আমরা ৬ দফা দাবি উত্থাপন করি এবং কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেয়।
.
দাবিগুলোঃ
.
১) ভিক্টিম ছাত্র এবং তার পরিবারের নিকট অফিসিয়ালি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (৩ কার্যদিবসের মধ্যে করা হবে)
.
২) তদন্ত সাপেক্ষে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এবং চাকরিচ্যুত করতে হবে। (৫ কার্যদিবসের মধ্যে করা হবে)
.
৩) হাসপাতালের মেডিকেল টেস্টগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হবে এবং টেস্টের ফলাফল সত্যতা যাচাই করতে হবে। (এটি ইতিমধ্যে করা হয়, ভবিষ্যতেও সতর্ক থাকবে)
.
৪) সকল টেস্টের মূল্য যৌক্তকভাবে কমাতে হবে এবং মূল্যতালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। (ইতিমধ্যে থাকা মূল্যতালিকা অন্য হাসপাতালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুণরায় পরিবর্তন করা হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে করা হবে)
.
৫) কোনো দলীয় লোক বা কোনো রাজনৈতিক নেতা হাসপাতাল পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না। (ভবিষ্যতে থাকবে না)
.
৬) সকল শিক্ষার্থীদের জন্য (শুধু ইউআইইউ নয়, সকল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) নামমাত্র ৫০ টাকা চিকিৎসা ফি নিয়ে বর্হিবিভাগে চিকিৎসা দিতে হবে। (৩ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে)

মাজার ভাঙা

ছোটবেলার প্রায়ই সন্ধার পর বাড়িতে মিলাদ হতো। পাড়া-প্রতিবেশীদের খাবারের দাওয়াত দেয়া হতো। শুধু আমাদের বাড়িতেই না, প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে এমন চিত্র দেখা যেতো। এটা মিস করি। সেই চিত্রটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগলো। এখন নির্দিষ্ট কিছু বাড়িতে মিলাদ হয়।
এই মিলাদ, এই কাওয়ালী সব কিছুই আমাদের অংশ। এদেশে মিলাদ থাকবে, কাওয়ালী থাকবে, মাজার থাকবে, মসজিদ থাকবে, মন্দীর থাকবে, গীর্জা থাকবে, গুরুদুয়ারা থাকবে, থাকবে মহররমের তাজিয়া মিছিল।
কোনোটি ভাঙার বা প্রতিহত করা বা অন্যের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা যাবে না।

ওয়াও বৃষ্টি পড়ছে, এরেস্ট হওয়ার জন্য রোমান্টিক ওয়েদার!

পুলিশের ভয়ে গ্রেফতার আতঙ্কে তখন আর বাসায় থাকি না। একদিন নিজের বাসায় ছিলাম, আমাদের ভেতরে রেখে বাহির থেকে নিচতলার একজন সদরদরজা তালা দিয়ে রেখেছিলো যেন পুলিশ আসার পর বলতে পারে যে এই বাসায় কেউ নেই। এমনই রিফিউজি জীবন কাটানো সময়ে নেত্রী নিরুপমা আর Min Haz হয়ে উঠে আমাদের ভরসার স্থল। কখনো হাজারিবাগ, কখনো বকশি বাজার, কখনো মোহাম্মদপুর রাত কাটাই। নিচের ছবিটি সারা রাত না ঘুমিয়ে সকাল ৭ টায় তোলা।
তেমনি একদিন আমি, Sampanna আর নি রু প মা রিকশায় করে গুলিস্তানের প্রতিবাদী মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে বকশি বাজার ফিরছিলাম। তখন হঠাৎ দেখি পলাশীর মোড়ে পুলিশ সবাইকে চেক করছে, আমরা সবাই তবদা খেয়ে যাই। কারণ আমরা তখন আন্দোলন থেকে ফিরছি আর সবার মোবাইলে অসংখ্য ছবি ভিডিও রয়েছে। তখন নিরুপমা হঠাৎ বলে উঠে, "ওয়াও বৃষ্টি পড়ছে, এরেস্ট হওয়ার জন্য রোমান্টিক ওয়েদার!"

জামায়াত ও নির্বাচন

জামাত জাতীয় নির্বাচনে তেমন সুবিধা করতে পারবে না কারণ তাদের তৃণমূল নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা নাই, তাদের মার্কার জনপ্রিয়তা নাই। নৌকা, ধানের শীষ, লাঙ্গল সবাই চিনি। কিন্তু জামায়াতের মার্কা কয়জন চিনে?
তারপর তৃণমূল নেতৃত্বের বিষয়, আপনার আসনে/এলাকায়/হোমটাউনে আপনি আওয়ামী লীগ এর এমপি কে হতে পারে, বিএনপির এমপির কে হতে পারে এমন একাধিক মানুষের নাম বলতে পারবেন। কিন্তু জামায়াতের ক্ষেত্রে কি তা বলতে পারবেন? নিজের এলাকায় জামায়াতের এমপি হওয়ার মতো জনপ্রিয় নেতা আছে এমন কয়জনকে চিনেন?
সেক্ষেত্রে ৩০০ আসনের সুষ্ঠু নির্বাচনের দৌড়ে জামায়াত সুবিধা করতে পারবে না।

'গুলি করি, মরে একটা, আহত হয় একটা...বাকিডি যায় না স্যার'

১৮ তারিখ রামপুরায় আমাদের উপর পুলিশের গুলি + ছাত্রলীগের হামলায় সময়ে ইউআইইউ এর একজন স্টুডেন্ট মাথায় মারাত্মকভাবে আহত হয়। ওর মাথায় প্রাথমিক ব্যান্ডেজ করার পর রাস্তার মধ্যের ডিভাইডারে বসে ছিলো। মাথার অবস্থা তখনো বাজে, রক্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই আপনাকে হাসপাতালে

পাঠাই, অথবা বাসায় বা কোনো সেইফ প্লেইসে পাঠানোর ব্যবস্থা করি"। সে তখন নিজের মধ্যে নেই, সে আমাকে মুখে বলতেসে, " না ভাই, আমি সামনের দিকে যাবো, আন্দোলনের এখান থেকে যাবো না। "। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতেসি সে যে আমাকে এই কথাটা বলতেসে সে বুঝতেসেও না সে কি বলতেসে, তার মুখে জিদে এটি বললেও তার শরীর যে সায় দিচ্ছে না, সে মারাত্মক অসুস্থ এটা স্পষ্ট। কিন্তু তার ভেতর ছিলো প্রতিবাদ, লড়াকু মানসিকতা, হার না মানা প্রত্যয়।
আগে একটা কথা প্রচলিত ছিলো যে, " একটা গুলি করলে এলাকা খালি"। এই বিষয়টি এই আন্দোলনে একদম ভুল প্রমাণিত করেছে ছাত্র জনতা। অবস্থা এমন ছিলো যে, আমার পাশের ছেলের গুলি লেগেছে কিন্তু আবার লাগে নাই, কারণ আমার ভাগ্য ভালো। এমন অবস্থায়ও আমরা পালিয়ে যাই নি, মাঠ ছাড়ি নি, ফাইট দিয়েছি। যে গুলি খাচ্ছে, আহত হচ্ছে তাকে আরো ২/৩ জনকে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে, আমরা বাকিরা ঠিকই আমাদের অবস্থানে অটল ছিলাম। আমাদের একজন শহীদ হয়েছে, পতাকায় মোড়ানো তার লাশ আমাদের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার জন্য খারাপ লেগেছে, কিন্তু আমরা ভয় পাই নি, আমরা পিছিয়ে যাই নি, এই অবস্থায় থেকেও আমরা সামনের দিকে এগিয়েছি। আমাদের এই মনোবল, এই হার না মানা মনোভাবের কারণেই আমরা জয়ী হয়েছি।
আমরা যারা এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, আমরাই হয়তো শুধু বুঝতে পারবো যে তখন আমাদের বুকে কি ঝড় ছিলো। এই দিনগুলো আমরা কখনো ভুলতে পারবো না।

Habiganj Govt High School is a Legacy of Excellence.

জেলা শহরের একটি হাই স্কুল, অথচ শুধুমাত্র ৫ তারিখ সরকার পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা পদোন্নতি পেয়ে যেসব পদে পদায়ন হয়েছেন:
- এএসএম আমানুল্লাহ, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩ ব্যাচ)
- Jalal Ahmed , চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
- ফয়েজ আহমেদ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
- শরফ উদ্দিন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (১৯৮৪ ব্যাচ)
- এজাজ আহমেদ, ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ
শুধু সরকার পতনের পর গত ১৫ দিনের কথা বললাম। এমন অসংখ্য অগণিত রত্নের জন্ম দিয়েছে জেলা শহরের একটি হাই স্কুল। দেশসেরা বিখ্যাত সব বিদ্যাপীঠের মতো হয়তো দেশের সবার মুখে মুখে এই বিদ্যালয়ের নাম নেই, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশসেরা এনজিও অর্থাৎ দেশের প্রতিটি সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। আমরা যারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমরা দেশ/বিদেশে যেখানে যে পজিশনেই থাকি না কেন, এই বিদ্যালয় নিয়ে গর্ব করে যাই। আমাদের ঠিকই মনে হয়, "ইশ! যদি ফিরে যেতে পারতাম সাদা ড্রেস পড়ে ঐ লাল বিল্ডিং এর জগতে!"
Habiganj Govt High School is a Legacy of Excellence.

সময়-জ্ঞান

এইচএসসিতে অটোপাস দেয়ার পর ধারণা করেছিলাম যারা অটোপাস চায় নি, যারা পরীক্ষা দিতে চায় সেই শিক্ষার্থীরা এবার আন্দোলন করবে। নটরডেম সহ অনেক কলেজ বিবৃতিও দিয়েছিলো তারা পরীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীরা আর আন্দোলনের দিকে যায় নি, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় যে যেভাবে পারে এগিয়ে

এসেছে। ১৭/১৮/১৯ বছর বয়সী এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা যে বিষয়টা বুঝে, বয়স্ক আনসাররা তা বুঝে নাই। আন্দোলন, দাবি দাওয়া উত্থাপন সবই ঠিক আছে, কিন্তু সময়-জ্ঞান থাকাটা জরুরি।

শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন

সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খালি করে আন্দোলন দমিয়ে ফেলার পর সেই ভয়াল ১৮ জুলাই, যেদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উত্তরা থেকে রামপুরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ হয়। সেদিন এতো লাশ ফেলার পরেও আমরা পেছনে হটিনি। পুলিশকে হেলিকপ্টারে করে পালাতে বাধ্য করেছি। সেই ১৮ জুলাই, যেদিনটি আমি ব্যক্তিগতভাবে হয়তো জীবনেও ভুলতে পারবো না। সেদিনই উত্তরা আজমপুর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আমাদের ভাই জাহিদুজ্জামান তানভীন। তিনি আইইউটির শিক্ষার্থী ছিলেন।
তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংকে জমানো টাকা টিএসসিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে বন্যার্তদের সহায়তায় দিয়েছেন তার মা। আজ রোববার (২৫ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে তার মা বিলকিস জামান টাকাগুলো জমা দেন। ছেলেকে হারানোর কষ্ট থাকলেও দেশের জন্য প্রাণ দেয়াতে গর্বিত বলেও জানান তিনি।
মৃত্যুর পরেও দেশের সেবায়। দেশপ্রেম, দেশপ্রেম, দেশপ্রেম।
রত্নগর্ভা মা বিলকিস জামানের জন্য শ্রদ্ধা।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

হবিগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ রিপন শীলের হত্যা মামলায় ৪২ নং আসামী বাবুল মিয়া, ৫৩ নং আসামী সাইকুল মিয়া, ৫৪ নং আসামী জয়নাল মিয়া সহ অনেককে নাকি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও বিএনপির দলীয় কোন্দলের কারণে আসামী করা হয়েছে। নিজেরা ক্ষমতায় আসার আগেই যদি এসব শুরু করেন, তবে জনগণ কিভাবে আপনাদের উপর ভরসা রাখবে?
এছাড়াও এজহারভুক্ত ৫৯ আসামীর মধ্যে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই তালিকায় ডুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যেখানে ছাড় পেয়েছে ঐদিন এই মারামারি/হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকা অনেকেই।
একজন শহীদ ব্যক্তিকে পুঁজি করে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মাধ্যমে শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর মাধ্যমে নোংরা রাজনীতি না করে অবিলম্বে নিরপরাধ ব্যক্তিদের ছাড় দিয়ে প্রকৃত দোষীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
এছাড়া শহীদ মুস্তাক নি ন্যায়বিচার পাবে না? তাঁর হত্যা মামলা হবে না? তাঁকে ভুলে যাচ্ছি কেন আমরা?
শহীদ মুস্তাক ও শহীদ রিপন শীলের স্মৃতি অমর করতে হবিগঞ্জের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ওদের নামে নামকরণ করার দাবি জানাচ্ছি।
আর মামলা মামলা খেলায় নিরপরাধ ব্যক্তিদের ডুকিয়ে, প্রকৃত দোষীদের ছাড় দিয়ে শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করবেন না।

ধানমণ্ডি ৩২

শুনেন, একটা স্পষ্ট কথা বলি

ধানমণ্ডি ৩২ নাম্বারের সামনে যেসব অপকর্ম হয়েছে সেখানে আমি ছিলাম না। গতকালকেও বলেছি আজকেও বলছি, বিনা কারণে ভিন্নমত পোষণের জন্য কারো উপর হামলা, কারো ফোন চেক করা, কাউকে হেনস্ত করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' যদি নব্য ফ্যাসিস্ট এর ভূমিকা নেয় তবে সেই 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' কে আমি ডিজঅওন করি। যে নেতা, যে সমন্বয়ক, যে কর্মী, যে শিক্ষার্থী এসব সমর্থন করে তাদেরকেও আমি ডিজঅওন করি। 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর প্রতি জনগণের যে আশা আকাঙ্খা, তা থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। এক ফ্যাসিস্টকে সরিয়ে আমরা নিজেরাই যেন ফ্যাসিস্টের ভূমিকায় অভিনয় না করি। জাতিকে আমরা আশা দিয়ে দ্রুতই আশাহত করছি, আমাদের আরো অনেক অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। এদেশ সকল জাতের, সকল মতের মানুষের জন্য হোক সত্যিকারের 'বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশ'।

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও জড়িত ভিসির পদত্যাগ দাবি

.

১) হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা ক্যাম্পাসে না হয়ে ঢাকায় হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। পরীক্ষার এক দিন আগে চাকরিপ্রার্থীদের মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়ে পরীক্ষার দিন-ক্ষণ জানানো হয়। চাকরিপ্রার্থীদের প্রবেশপত্র না দিয়ে পরীক্ষার আগমুহূর্তে কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে বলা হয়। সেই সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়ার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। (সূত্রঃ প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪)

.

২) নাম প্রকাশ না করার শর্তে চাকরিপ্রার্থী এক নারী বলেন, আগে থেকে জানার চেষ্টা করি মৌখিক পরীক্ষা কবে, কোথায় হবে। কর্তৃপক্ষ বলেছিল, জানানো হবে যথাসময়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়ে রোববার জানাল যে সোমবার পরীক্ষার দিনক্ষণ। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয়নি কোনো প্রবেশপত্র। কেন্দ্রে গিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাত্র একদিন আগে মুঠোফোনে খুদে বার্তায় পাঠিয়ে পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান বিষয়ে জানায়। এত কম সময় নিয়ে জানানোয় অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় যথাসময়ে অংশ নিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। (সূত্রঃ প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪)

.

৩) হবিগঞ্জ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থাকার পরেও ঢাকায় মৌখিক পরীক্ষা নেওয়াকে রহস্যজনক বলে মনে করছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিছবাউল বারী চৌধুরী। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে লুকোচুরি করছে। দায়িত্বশীলদের উচিত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা। (সূত্রঃ প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪)

.

৪) যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক প্রার্থীই এসএমএস পাননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। (সূত্রঃ দেশ রূপান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪)

.

৫) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পরীক্ষার্থী জানান, ৬০০ টাকা নিয়োগ পরীক্ষা ফি নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাত্র একদিন আগে মোবাইলে এসএসএম দিয়ে পরীক্ষার নোটিশ পাঠিয়েছে। তার অভিযোগ এতো কম সময়ে পরীক্ষার তারিখ দেয়ার কারণ কি? এছাড়া হবিগঞ্জ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থাকার পরেও ঢাকায় পরীক্ষা নেয়া রহস্যজনক। (সূত্রঃ দেশ রূপান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪)

.

৬) পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে পরীক্ষার নিকটবর্তী সময়ে এসএসএম দেয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ পরীক্ষার্থীরা আমাকে জানাননি। এটি সাংবাদিকদের প্রশ্ন হতে পারে। ঢাকায় হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অফিস কোথায় জানতে চাইলে বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। (সূত্রঃ দেশ রূপান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪)

.

৭) সুত্র জানায়, বিভিন্ন পদে উত্তীর্ণ হওয়া অনেকেই হবিগঞ্জ-৩ আসনের সাংসদ অ্যাডভোকেট আবু জাহির এমপির আত্নীয়স্বজন। যোগ্যদের কৌশলে বাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বুধবার (২০মার্চ) রাত সাড়ে ৮টায় জামাল আহমেদ হিমু নামে একজন চাকরি প্রত্যাশি বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগম মাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। তিনি লিখেনÑহবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার নিজের টাকা দিয়ে আবেদন করলাম কিন্তু একবারও পরীক্ষার সুযোগ দিল না, কিন্তু তাদের নিয়োগ কার্যক্রম নাকি শেষ। অথচ আবেদন করার সময় তাদের সব রিকোয়ারমেন্ট পুরণ করেই আবেদন করেছি। শুনলাম আমার মতো অনেকেই পরীক্ষা দেওয়ার ও সুযোগটা পাননি। চাকরি হউক বা না হউক,আবেদনকারীদের পরীক্ষার সুযোগটা তো অন্তত দেয়া যেত না? (সূত্রঃ আমার হবিগঞ্জ, ২১ মার্চ ২০২৪)

.

৮) কাজী খোকন নামে একজন লিখেছেন-স্বায়ত্তশাসন পাওয়া মানেই কি যা ইচ্ছা তা ই করতে পারেন কি উপাচার্য? গত ১৯ মার্চ দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার ফার্মগেটের কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সিন্ডিকেট সভায় এসব পদে উত্তীর্ণদের নাম ঘোষণা করেন উপাচার্য ড.আবদুল বাসেত। ফলাফল ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের সাংসদ অ্যাডভোকেট আবু জাহির। (সূত্রঃ আমার হবিগঞ্জ, ২১ মার্চ ২০২৪)

.

ফলাফল প্রকাশের পর আমরা দেখতে পাই, ফেইসবুকে এমপির অনুসারীদের সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। নিচে একটি স্ক্রিনশট যুক্ত করলাম। কিসের পরিশ্রম? পড়ালেখার? নাকি এমপির পিছনে চামচামির পরিশ্রম?

.

এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত দুর্নীতিগ্রস্ত উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবদুল বাসেত এর পদত্যাগ সময়ের দাবি।

.

(অনেকেই হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার নির্ধারিত স্থান বানিয়াচং উপজেলার নাগুরা ফার্মে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন)

.

সোর্সঃ ১. https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/aqdodpnv01
২. https://www.deshrupantor.com/.../%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6...
3. https://amarhabiganj.com/%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0.../

এখন সময় ঘরে ফেরার

সপ্তাহখানেক আগেও প্রতিদিন জুতার নিচে আইডি কার্ড লুকিয়ে বাসা থেকে বের হতে হতো, এলাকার গলিতে ছাত্রলীগ রাস্তায় পুলিশ, যেন শিক্ষার্থী হওয়াটা ছিলো অপরাধ। মোবাইলের গ্যালারি থেকে প্রতিদিন ১০০+ ছবি ডিলেট করে, ভিপিএন সহ ৬/৭ টা এপস হাইড করে বাসা থেকে বের হতাম। কিছুই দমাতে পারে নি, প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও পারবে না। কিছু শঙ্কা থাকলেও সেই উত্তাল সময় এখন অনেকটাই শেষ, স্বৈরাচারের পতন হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, এখন সময় ঘরে ফেরার।

.

জুলাই সাত তারিখে শাহবাগে গিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই থেকে শুরু, কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে স্বৈরাচার পতন আন্দোলন, ভয়াবহ বন্যার পর UIU Reform আন্দোলন সবমিলিয়ে কেটে গেল দুই মাসের অধিক সময়। এই সময়ের মধ্যে নিজের কোনো কাজই করা হয় নি। ক্লায়েন্টের কাজ, ইন্টার্নশিপের কাজ, প্রফেশনার কোর্স, একাডেমিক সব মিলিয়ে হাজার কাজের স্তুপ জমে আছে। এখন বোধহয় সময় হয়েছে ঘরে ফেরার...

ভুয়া সমন্বয়ক

সরকার পতন অর্থাৎ ৫ তারিখের পর আজ পর্যন্ত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এর কোনো কমিটি গঠন করা হয় নি। এরপর হবিগঞ্জ সহ বিভিন্ন জেলার যেসব কমিটি দেখতে পেয়েছেন সবই ভুয়া।

ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের রাফি ভাই, সিলেটের আসাদুল্লাহ গালিব ভাই সহ যারা পূর্বে সমন্বয়ক ছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, বিভিন্ন এলাকার সমন্বয়কদের আপনারা সকলেই চিনেন। তাঁদের কাউকে দেখবেন না হল দখল কিংবা ক্ষমতা প্রদর্শন করে কোনো অবৈধ কাজ করতে। সব কিছু স্বাভাবিক রাখতে সারা দেশের সবাই এখনো নিরলসভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন।

ভুঁইফোড়, ভুয়া সমন্বয়ক সহ যে কেউ যদি ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বিতীয় ছাত্রলীগ হওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করুন। আইনের হাতে সোপর্দ করুন। এদেরকে শক্তিশালী হতে দিবেন না, মনে রাখবেন ছাত্রদের সম্মিলিত শক্তির কাছে স্বৈরাচারও ঠিকতে পারে নাই। আশা করি অতি শীঘ্রই এদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র থেকেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিয়ে আমি আশাবাদী। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সহ অনেক বিষয়ে ছোটখাটো অনেক ভুল ত্রুটি আছে, হয়তো সামনেও থাকবে। কিন্তু এই ভুল ত্রুটি বিষয়ে সবাই কথা বলছে, প্রশ্ন করতে পারছে, এটাও আশার বিষয়। এই সরকারের উপর আমাদের প্রত্যাশা অনেক, আশা করি জাতি আশাহত হবে না। রাষ্ট্রের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যেকোনো বিষয়ে রাষ্ট্রের মালিক তথা জনগণ প্রশ্ন করতে পারবে, এমন বাংলাদেশই চেয়েছিলাম। প্রশ্ন করার জন্যই হয়তো পরবর্তীতে আর এমন ভুল হবে না। প্রশ্ন করা থামানো যাবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (মেয়াদ)

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩ বছর+ মেয়াদী হলে এই সময়ের মধ্যে হয়তো ছাত্র-জনতা বা নতুন প্রজন্মের নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে যেটি জনগণের আশার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে এবং কাউকে খালি মাঠে গোল দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবে।

আশা

আগের বাংলাদেশ আর পরের বাংলাদেশ এর মধ্যে অনেক পজিটিভ পার্থক্য থাকবে।
ভরসা রাখুন, বিপ্লবকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না, যারা অংশ নিয়েছিলো তাদের কমেন্ট/ইনবক্সে "আরো করো আন্দোলন/আগেই জানতাম" টাইপ কথাবার্তা বলে তাদেরকে হতাশ করবেন না। এমনটা করে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন যে আন্দোলনটা ইনভ্যালিড ছিলো? এই ১৬ বছরের নির্বাচন বিহীন, লুটপাত, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, শত শত লাশের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি, প্রশ্ন করেন নি বলে অন্য কেউ করবে না, চুপ করে থাকবে সেটি কেমন করে হয়? শত শত ছাত্রজনতার লাশের উপর স্বৈরাচার টিকে থাকবে, এর বিকল্প নাই এইটা ভাবটাই আপনাদের বোকামি।
এই বিপ্লবের আগের বাংলাদেশ এবং পরের বাংলাদেশ দুটি একরকম হবে না, পরের বাংলাদেশ হবে সাম্য, মানবিকতা, ন্যায় ও পরমতসহিষ্ণুতার বাংলাদেশ, এমনটাই আমরা আশা করি।

বিজয়!

দীর্ঘদিন যাবত গ্রেফতার আতঙ্কে বাসায় যাই না। গত তিনদিন যাবত এক কাপড়ে কাটাচ্ছি। আজকে বাসায় যাব। এই মুক্তির পর ভালো করে খাওয়া, ভালো করে গোসল, ভালো একটা ঘুম এরকম ক্ষুদ্র ইচ্ছেও কারো হতে পারে?
অভিনন্দন অভিনন্দন

তারপর?

দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতির ফায়দা নিয়ে জামাত বিএনপি বা কোনো তৃতীয় শক্তি যদি অনির্বাচিত ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধও আমাদের ছাত্র-জনতাকেই করতে হবে।

১ দফা মেনে সরকার ও মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে পরে কি হবে?
সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সরকার গঠন হবে, সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছুদিন (২/৩ মাস) সময় দিয়ে নির্বাচন আহ্বান করবে, তারপর জনগণের ভোটে যে সরকার নির্বাচিত হবে সেই সরকার আমরা মেনে নিব।

ক্ষমতার দম্ভ

পুরো পরিস্থিতিটা আজকের এই জায়গায় নিয়ে আসার পেছনে দায়ী ওদের ক্ষমতার দম্ভ। এই দম্ভটা স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য, যে আমি ৩ বার নির্বাচিত হয়েছি জনগণ ছাড়াই, ওদের গোনায় ধরি না।
জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইলে এতো দম্ভ থাকতো না।

ওরা নাকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী!

ওরা নাকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, অথচ হাইকোর্টের সামনে কোনো অপরাধ ছাড়াই রিকশা থেকে টেনে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠায়, শিক্ষার্থী হলেই গ্রেফতার করে, মানুষের মোবাইল চেক করে, আমাদের শান্তিপূর্ণ র‍্যালি নতুন বাজারেই আটকে দেয়। কোন আইনে ওরা করে? এদেশে হাইকোর্টের সামনে গিয়ে আমাদের স্লোগান দিতে হয় যে আমরা ন্যায়বিচার চাই, এটা কি লজ্জাজনক না?

৯ দফা কিন্তু ১ দফায় রুপান্তরিত হতে বেশিদিন লাগবে না

শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার চেয়েছিলো, আপনারা লাশের মিছিলের উপর দিয়ে গিয়ে কোটা সংস্কার করেছেন, যেটা অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিলো। একইভাবে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ৯ দফা দাবি করছে, লাশের সংখ্যা আর দীর্ঘায়িত করবেন না। মামলা, হামলা, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, গুলি, গুম, খুন কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের দমাতে পারবেন না। ৯ দফার যৌক্তিক দাবিগুলো খুব দ্রুত মেনে নিন। ৯ দফা দাবি মানতে পূর্বের কোটা সংস্কারের মতো দেরী করলে আর এইভাবে ছাত্রজনতার উপর গুলি চালালে, ৯ দফা কিন্তু ১ দফায় রুপান্তরিত হতে বেশিদিন লাগবে না। খুব দ্রুত, খুব দ্রুত।

শিক্ষক

মা-বাবার পর শিক্ষার্থীদের অভিভাবক হিসেবে সম্মানিত শিক্ষক ও ইউনিভার্সিটি অথোরিটির যে সক্রিয় ভূমিকা আমরা আশা করি, তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করি। আপনার সন্তানদের উপর যেভাবে গুলি করা হয়েছে, যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে, সবকিছু দেখে একজন বিবেকবান শিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে আপনাদের নিষ্ক্রিয়তা আমাদের হতাশ ও ক্ষুব্ধ করছে।
কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষক উনাদের ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমাদের সহযোগিতা করার যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
এই মুহূর্তে আপনাদের আমাদের খুবই প্রয়োজন। আপনারাই আমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার শিক্ষাদান করেন। শিক্ষার্থীদের উপর হওয়া অন্যায় নিজ চোখে দেখেও যদি আপনি নিরব থাকেন কিংবা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি আমাদের শিক্ষাদানের নৈতিক যোগ্যতা হারাবেন বলে আমরা মনে করি।
সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আহ্বানঃ নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে সম্মিলিতভাবে টাস্কফোর্স গঠন করে শিক্ষার্থীদের পাশে সক্রিয়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করবেন

আমার নিরাগ লাগে ভারি

ঘুমের কথা তো বাদ দিলাম। সকালে তো এমনিতেই খাই না, দুপুরের খাওয়াও কয়েকদিন যাবত খেতে ইচ্ছে করে না। শরীর যখন চূড়ান্ত দূর্বল হয়ে যায় তখন রাতে হালকা কিছু খাই। প্রতি রাত যায় গ্রেফতার আতঙ্কে। জানালার পাশে বসে গুলির আওয়াজ শুনি৷ আজকের সকাল দুপুর রাতের কোনো খাবারই এখনো খাই নি, ইচ্ছে হয় না৷ পলক সাহেবের একা একা ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো যদি খাবার ও একা একা হয়ে যেত, পেটটাও একা একা ভরে যেত, শরীর দূর্বল লাগতো না, আমার কিছুই করা লাগতো না, তবে কি ভালো হতো!

অপরাধটা কী করেছি?

যেহেতু উনি বিভ্রান্ত, বুঝতে পারছেন না উনার অপরাধ কী, তাই উনাকে ধরিয়ে দিচ্ছিঃ
ভুল ১: কোটা সংস্কার আন্দোলনকে গুরুত্ব না দেয়া, চীন থেকে এসে প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই এটার সমাধান না করা।
.
ভুল ২: ১৭ তারিখ রাত্রে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে কার্যকর কিছু না বলা, যৌক্তিক সমাধানের পথ বেচে না নেয়া।
.
অপরাধ ১: সারা দেশের মানুষকে হয় মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি নয় রাজাকারের নাতিপুতি এই সরল বাইনারি করা, দূরদর্শিতার অভাব, সাংবাদিকের ফালতু প্রশ্ন স্মার্টলি ডিল করতে না পারা।
.
অপরাধ ২: আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়া, মন্ত্রীদের ছাত্রলীগকে জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়ে উস্কিয়ে দেয়া, যেটা ফৌজদারি অপরাধ ও বটে। ওবায়দুল কাদের, দীপু মনি, পলক সহ যেসব মন্ত্রীরা ঐদিন রাত্রে উস্কানি দিয়েছেন সবার পদত্যাগ করা প্রয়োজন।
.
অপরাধ ৩: শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভাবা, শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক ভাবে ডিল করতে চাওয়া, প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান।
.
অপরাধ ৪: ঢাবি ও জাবি তে পুলিশ বিজিবি দিয়ে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় খালি করা।
.
অপরাধ ৫: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে স্থল ও আকাশপথে গুলি বর্ষণ করা।
.
অপরাধ ৬: শতাধিক শিক্ষার্থী হত্যা করা।
.
অপরাধ ৭: শিক্ষার্থী হত্যার দায় স্বীকার না করা। পরিস্থিতি উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা না নেয়া।
.
অপরাধ ৮: মানুষের জীবনের চেয়ে মেট্রোরেল, বিটিভির মূল্য বেশি দেখানো, অতিরিক্ত অভিনয়।
.
অপরাধ ৯: শিক্ষার্থীদের পুলিশ, ডিবি দিয়ে এখন পর্যন্ত হয়রানি ও নির্যাতন করা।
.
অপরাধ ১০: শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবি মেনে না নেয়া।

আরো অনেক আছে, অপরাধের তালিকাটা অনেক দীর্ঘ, কোনটা ছেড়ে কোনটা লেখব? আপাতত এগুলোই থাক

দায় কার?

২০১৮ সালে প্রথম যখন বৃহত্তর পরিসরে কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়, তখনও কেউ কোটার পুরোপুরি বাতিল চায় নি। দাবি ছিলো সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কার। কিন্তু সরকার প্রধান তখন আন্দোলনের চাপে শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরিতে কোটা বাতিল করেন।

পরবর্তীতে ২০২৪ সালে এক রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কোটা বাতিল করে সরকার যে পরিপত্র জারি করেছিলো সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করে, কোটার পুনর্বহাল করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে শিক্ষার্থীরা কোটাপ্রথা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত ৪ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায়।

আন্দোলন যখন খুব ভালোভাবে দানা বাধে এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে যায় তখন সরকারপ্রধান রাষ্ট্রীয় সফরে চিন অবস্থান করছিলেন। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ভেবেছিলো সরকার প্রধান দেশে ফিরে হয়তো এটির যৌক্তিক সমাধান দিবেন।

দেশে ফিরে আসার পর সংবাদ সম্মেলনে সরকারের পা-চাটা সাংবাদিক 'প্রবাস আমিন' খুবই উদ্দেশ্যপ্রণিত ভাবে প্রশ্ন করে 'মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি এবং রাজাকারের নাতিপুতির মধ্যে আপনি কাকে চাকরি দিবেন?"। প্রশ্নটায় সবাইকে এতোটাই সরলভাবে বাইনারি করা হয় যেন দেশে মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি ছাড়া বাকি যারা রয়েছেন, সবাই রাজাকারের নাতিপুতি। সরকার প্রধান খুবই অদূরদর্শীভাবে উত্তর দেন যে, মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিদের চাকরি দেব নয়তো কি রাজাকারের নাতিপুতিদের চাকরি দেব? যেন মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি এবং রাজাকারের নাতিপুতি এই দুই প্রকার ব্যাতিত দেশে আর কোনো জনসংখ্যা নেই। সেদিন রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে। বিভিন্ন হল থেকে মেয়েরা তালা ভেঙে পর্যন্ত রাস্তায় বের হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্লোগান উঠে

"তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার"

"কে বলেছে কে বলেছে, সরকার সরকার"

"চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার"

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সরকার শিক্ষার্থীদের পালস না বুঝে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের মন্ত্রী এবং সরকারদলীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরের দিন ঘোষণা দেয়, "আন্দোলনকারীদের ছাত্রলীগ মোকাবেলা করবে"। যেন ছাত্রলীগকে লাইসেন্স দেয়া হয় আন্দোলনকারীদের পেটানোর। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী যারা সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় যেমন জুনায়েদ আহমেদ পলক, ডা দিপু মনি প্রমুখ ফেইসবুকে উস্কানিমূলক পোস্ট দেয়। পেটানোর লাইসেন্স পেয়ে ছাত্রলীগ পরের দিন ন্যাক্কারজনকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রক্তে ক্যাম্পাস রঞ্জিত করে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়। এই হামলার ছবি যখন সারাদেশে ছড়িয়ে যায়, তখন ছাত্রলীগ সারা দেশে তুমুলভাবে সমালোচিত হয় এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বেগ পায়। যে আন্দোলন শুধুমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ ছিল, তা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রথম দিন আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যোগ দেয়, এবং পরের দিন দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয়।

১৭ তারিখ রাতে সরকার প্রধান আবারো দেশবাসির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। তিনি চাইলে ঐদিনই এক কথার মাধ্যমেই পুরো পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার ভাষণে কার্যকরী কিছুই বলেন নি। উলটো সরকার

প্রধানের ভাষণ চলাকালীন সময়ে পুলিশ বিজিবি যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় খালি করার মিশনে নামে, শিক্ষার্থীদের উপর গুলি করে।

১৮ তারিখ আবার রাজপথে নামে শিক্ষার্থীরা। লক্ষণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশের আন্দোলনে গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি সহিংসতা খুবই স্বাভাবিক হলেও এই আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করা ব্যাতিত কোনো সহিংসতামূলক কর্মকান্ডে অংশ নেয় নি। তারপরেও পুলিশ শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে নির্বিচারে গুলি করে। পুলিশের গুলিতে সারা দেশে শতাধিক শিক্ষার্থী নিহত হয়, যা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম কলঙ্কিত ঘটনা।

রাজধানী ঢাকার উত্তরা থেকে রামপুরা এই পুরো রাস্তাটি ছিলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দখলে। অন্তত ১/২ জন শহীদ হয় নি এমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ব্র্যাক, ইস্টওয়েস্ট, ইউআইইউ, এনএসইউ, আইইউবি, এআইইউবি, নর্দান সহ প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক শিক্ষার্থী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। শুধুমাত্র ১৮ জুলাই ঢাকার উত্তরা থেকে রামপুরা এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জনের অধিক শিক্ষার্থী নিহত হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আন্দোলনে গিয়েছিলো তাদের ২০%-৩০% শিক্ষার্থী হয়তো পরিস্থিতিতির কারণে সরকারি চাকরি করতো, কিন্তু ছাত্র থাকাকালীন ৯০% এর অধিক শিক্ষার্থীর সরকারি চাকরি করার কোনো ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তারা কেন সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কারের এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো? কারণ আগের দিন প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ এবং পুলিশ হামলা চালায়। এই যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর এই ন্যাক্কারজনক হামলা এটার প্রতিবাদেই মূলত তারা আন্দোলনে যোগ দেয়। এবং অনেকে জীবন দিয়ে রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলে। শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশ রামপুরায় কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাদ ব্যবহার করে র‍্যাব ও এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টারে করে পলায়ন করে।

সরকারের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স তাদের পেটুয়া ছাত্রলীগকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার নির্দেশ দিয়ে যে ভুল করেছিলো, তার খেসারত হিসেবে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে সেনাবাহিনিকে রাস্তায় নামাতে হয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে।

১৮ তারিখ এতোগুলো তাজা প্রাণ হত্যা করার পর সরকারের মন্ত্রী হাসান মাহমুদ ঘোষণা দেয় যে, শিক্ষার্থীদের দাবি মানতে সরকার রাজি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে কেন সরকার এতগুলো ছাত্র হত্যা করলো? সরকারের অতি অহংকার, জনগনবিমুখতা খুবই নগ্নভাবে প্রকাশ পায় এই আন্দোলনে।

১৮ তারিখ আন্দোলনের পর ১৯ তারিখ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাস্তায় ছিলো না, তখন রাস্তায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকজন। তারা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের এই পরিস্থিতি ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। ফলস্বরুপ আজ ২৩ জুন, এখন পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা বিদ্যমান, এবং সারাদেশে নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু পরিস্থিতি এতো খারাপ অবস্থায় নেয়ার আগেই কি সব সমাধান করা যেত না? এই লাশের মিছিলের চেয়ে সরকার দলের অহংকার ও দাম্ভিকতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল? এই প্রতিটি শিক্ষার্থী হত্যায় দায় অবশ্যই সরকারের।

ইরফান ভূঁইয়া

যাত্রাবাড়ী কতুবখালী আড়তের পাশে পুলিশের গুলিতে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ছাত্র মোঃ ইরফান ভূঁইয়া মাত্র মারা গেলো।

তার আইডি কার্ডে ভেতর ১০০০ টাকা নোট, সেই নোটে বঙ্গবন্ধুর ছবি শহীদ ইরফানের লাশে দিকে তাকিয়ে আছে।

আর কত মেধাবী ছাত্রের প্রাণ ঝড়লে শেখের বেডি খুশি হবে?

১৮ জুলাই

বিশ্বাস করেন ভাই, সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে গেসে।

আজকে শাহজাদপুর, উত্তরবাড্ডা, রামপুরায় যখন আমাদের উপর পুলিশ গুলি চালায়, তখন সাধারণ মানুষজন লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় নামসে, টিয়ারশেল থেকে বাচার জন্য আমাদের ফ্রি পেস্ট মাস্ক পানি খাবার সবকিছুর ব্যবস্থা সাধারণ মানুষজন করে দিসে।

সাধারণ মানুষজন রাস্তায় নামায়, টোকাইরা ও আর সাহস পেয়ে এগুতে পারে নি। একমাত্র সাধারণ মানুষজনের সহযোগিতায় আমাদের ছাত্রদের লাশের মিছিল বাড়তে পারে নি। একটা পিচ্ছি ১০/১২ বছর বয়সী ওর পাও রাবার বুলেটে ঝাঝড়া হয়ে গেসে। নারী পুরুষ শিশু যে যেভাবে পারে নিজেদের পুরোটা উজাড় করে আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে। আমরা যখন রামপুরা থেকে বাসায় ব্যাক করি তখন টোকাইদের আক্রমণের আতঙ্ক ছিলো, কিন্তু আন্দোলন স্থান থেকে রাস্তায় এসে দেখি পুরো রাস্তা সাধারণ মানুষের দখলে। তারা ৫ ঘন্টা পরেও খাবার, পানি দিয়ে সবাইকে সহযোগিতা করছেই। এই এলাকার সর্বসাধারণকে সালাম।

আর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যেভাবে বুক চিতিয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্রয়, চিকিৎসা সহ সার্বিকভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে তা অতুলনীয়। ব্র্যাক তোমায় মনে থাকবে।

আমার/আপনার/আমাদের সাদা পোষাকে লাল আইস্ক্রিমের দাগ যেন লাল রক্তের দাগে রুপান্তর না হয়

হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের যেসব ব্যাচ ইতিমধ্যে কোটাবিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিক দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন এবং শিক্ষার্থীর উপর হামলার ঘটনায় নিজ ব্যাচের কেউ অংশ নিলে তাকে ব্যাচ থেকে ও ব্যাচের সামগ্রিক কার্যক্রম হতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবেন বলেছেন তাদেরকে সাধুবাদ।

আগামীকাল আমাদের বিদ্যালয়ের ছোট ভাইদের একটা কর্মসূচির পোস্টার দেখলাম ফেইসবুকে। ওরা আমাদের স্কুলের ছোট ভাই, একসময় ওদের জায়গায় আমরা ছিলাম। এবার প্রতিটি ব্যাচ থেকে একটি ঘোষণা চাই, যে আগামীকাল আমাদের ছোট ভাইদের কর্মসূচির নিরাপত্তা নিশ্চিতে আপনি এবং আপনার ব্যাচ উপস্থিত থাকবেন যেন কেউ ওদের উপর হামলা করতে না পারে, ওদের ক্ষতি করতে না পারে।

আমরা ১৮ ব্যাচের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এই ঘোষণা দিয়েছি, এবং আমাদের যারা হবিগঞ্জ অবস্থান করছে, আশা করি সবাই আগামীকাল উপস্থিত থাকবে।

একইভাবে সিনিয়র ব্যাচগুলো সহ ১৬,১৭,১৯,২০,২১,২২,২৩ প্রতিটা ব্যাচ থেকে এমন একটি ঘোষণা চাই, এবং প্রতিটি ব্যাচের যারা যারা হবিগঞ্জ থাকবেন তারা নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের এই যৌক্তিক দাবিতে অংশ নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্তত এইভাবে প্রতিটি ব্যাচ ঘোষণা দিলে এবং মাঠপর্যায়ে উপস্থিত থাকলে ছাত্ররা সাহস আর মনোবল পাবে। আমার/আপনার/আমাদের সাদা পোষাকে লাল আইস্ক্রিমের দাগ যেন লাল রক্তের দাগে রুপান্তর না হয়, এমন কিছু আমরা কেউই দেখতে চাই না। ওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

১৬ জুলাই

সকাল থেকে নতুন বাজার টু ইউআইইউ এই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় টোকাইরা গ্রুপ করে করে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের রিকশা থেকে পর্যন্ত নামিয়ে আইডি কার্ড চেক করসে, ব্যাগের ভেতর ও চেক করসে, যথেষ্ঠ পরিমাণ হেনস্তা করসে সিংগেল স্টুডেন্টদের। আমাদের ভার্সিটির শাটল বাসেও হামলা করার চেষ্টা করসে। সকাল থেকে বাড্ডা থানা পুলিশের গাড়ি আমাদের ক্যাম্পাসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো।
তারপর আমরা ১১ টার দিকে ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে মিছিল নিয়ে বের হয়ে নতুন বাজারের দিকে রওনা দেই। ক্যাম্পাসের সামনেই বাড্ডা থানা পুলিশ আমাদের আটকানোর চেষ্টা করে। আমরা মিছিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। ফ্যামিলি বাজারের সামনে টোকাইরা হামলা করে। দুই পক্ষে কিচ্ছুক্ষণ ঢিল ছোঁড়ার পর আমরা ওদের ধাওয়া দেই। ধাওয়া খেয়ে ওরা এলাকার গলি দিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়।
আমরা নতুন বাজার গিয়ে অবস্থান নেই। নতুন বাজারে ইউআইইউ এর সাথে এসে ডিআইইউ, ইউআইটিএস, নর্দান এবং শেষের দিকে এনএসইউ, এআইইউবি, কিছু কলেজ এর শিক্ষার্থীরা সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। আমরা বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করি। ৫ টার পর আমরা সবাই দলবদ্ধভাবে নিজেদের বাসায় ফিরি যাতে কেউ হামলা না করতে পারে।
কিন্তু নিজেদের বাসায় এসেও আমরা নিরাপদ না। সাতারকুল ইতিমধ্যে টোকাইরা বাসায় বাসায় গিয়ে হামলা করছে। আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় ৭/৮ জন টোকাই গিয়ে মারধর করে আন্দোলনে ছিলো এই অভিযোগ করে ৩ জনের আইডি কার্ড নিয়ে গেসে। একটা দোকানের কথা বলে বলসে ঐ দোকান থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে।
এমনকি আমাদের ভার্সিটির গ্রুপ পর্যন্ত ওরা মনিটর করছে।
এমতাবস্থায় আমরা সাইনগর, দশতলা, সাতারকুল যারা আছি অন্তত আজকের রাত এবং আগামী কিছুদিন কেউই নিরাপদ না।

রাজাকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা কই?

এই যে ১৫ বছর ক্ষমতায়, ১৫ বছরে রাজাকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আপনি/আপনারা করতে পারেন নাই কেন?? বিচারের মুখোমুখি করতে পারেন নাই কেন? ক্ষমতার অভাব না সদিচ্ছার অভাব? না কি রাজাকারের তালিকা তৈরি হলে, প্রকাশিত হলে, বিচার হলে আপনার/আপনাদের আত্মীয়স্বজন সহ দলের অনেকেই ফেঁসে যাবে?
আমি রাজাকার না,
আমি রাজাকারের নাতিপুতি না।
আপনার ইঙ্গিতপূর্ণ অভিযোগ আমি গায়ে মাখছি না।
কোটাপ্রথার যৌক্তিক সংস্কার চাই।

বিসিএসের প্রশ্ন ফাঁস

২০১৮ সালে প্রতিটি এসএসসি পরীক্ষার ৩০ মিনিট আগে সারা বাংলাদেশের সবার মোবাইলে প্রশ্ন চলে যেত, একদম ফ্রিতে। এসএসসি পরীক্ষায় এপ্লাস না পাওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণের একটি কারণ এই প্রশ্ন ফাঁস। বাংলা ২য়

পত্র পরীক্ষার আগে প্রশ্ন সহ উত্তর পাওয়া গেল, হাতে এতো সময় নেই, সবাই শুধু অব্জেক্টিভ এর উত্তরের নাম্বার (১ এর গ, ২ এর খ ইত্যাদি) মুখস্ত করে গেলাম।
প্রশ্ন পাওয়ার পর দেখি সব হুবহু কমন, দিলাম সব দাগিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা শেষে হল থেকে বের হয়ে সবার মাথায় হাত। প্রশ্ন ঠিকই ছিলো, কিন্তু আমরা যে উত্তর মুখস্ত করে গেলাম ঐ উত্তরগুলো ভুল। ফেইল করি করি অবস্থা। এটা আমাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিলো, তারপরের সব পরীক্ষায় প্রশ্ন সহ উত্তর পাওয়ার পরেও এই ভুল আর করি নি। ফলস্বরূপ আমরা ম্যাক্সিমাম বাংলায় এ মাইনাস পাই।
এইচএসসি পরীক্ষা আর দিতে হয় নি, তাই প্রশ্নফাঁসের কলঙ্ক নেই কিন্তু অটোপাসের কলঙ্ক নিয়ে বের হয়ে যাই কলেজ থেকে। পচে যাওয়া সিস্টেমের স্বাক্ষী তো আমি নিজেই। কিন্তু এতোদিন পিএসসিকে দূর্নীতিমুক্ত ভাবতাম। আমার মতো যারা এতোদিন অন্তত পিএসসিকে দূর্নীতি মুক্ত ভাবতেন তাদের জন্য সমবেদনা। এদেশের উপর থেকে নিচ সব পঁচা আবর্জনা, ঘাটলেই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, হবে।

কোটা সংস্কার

আমার বাবার অনেক ইচ্ছে থাকলেও এখন পর্যন্ত আমার বিসিএসে অংশ নেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। কোনো ধরণের ইঁদুর দৌড় বা রেট রেসে অংশ নেয়ার ইচ্ছে আমার কখনো হয় না। যে কারণে এইচএসসির পর কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে আমি যাইনি।
কিছুদিন আগে সকাল সকাল পরীক্ষা দিতে এসে মাথায় পেনসিল রেখে টেবিলে ঘুমিয়ে পড়া এক বাচ্চার ছবি প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছিলো। আমি অনেকটা ঐ ছেলের মতোই, জীবনানন্দ দাশের ভাষায় "জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা অন্য সবাই বহন করে, করুক; আমি প্রয়োজন বোধ করি না।"
কিন্তু ২০১৮ সালে বিশাল এক ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকারি পরিপত্র জারির মাধ্যমে যে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, তা ২০২৪ সালে আদালতে বেআইনি ঘোষণা করায় যথেষ্ট অবাক হয়েছি।
কোটা তো একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিংবা সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার। তাঁদেরকে শুধু এই কারণে কোটা দেয়া যায় যে, তারা প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে। কিন্তু অন্য কোটাধারীরা সাধারন শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করছে না। তাই চাকরির জন্য যুদ্ধটা এদের সাথে সাধারণের অবশ্যই সমানে সমান হওয়া উচিত। কেউ যদি পদ পেতে চায়, সে যোগ্যতা দিয়ে পাক। সবাই আমরা ভাত খাই, একই কাগজে লিখি, একই বই পড়ি, পড়ার সুযোগ গড়পড়তা আমরা সবাই সমান পেয়েছি। এমতাবস্থায় একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে মেধাতালিকার ১৫০০ তম কাউকে বাদ দিয়ে ৫৬৮০ তম কাউকে পদ দিয়ে দেয়াটা বড্ড আনফেয়ার।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, মানুক বা না মানুক মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ব ঐতিহ্য। ২০১৬ সালে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কোর ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ’ বিষয়ক আন্তঃসরকার কমিটির ১১তম অধিবেশনে এ শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়।
ঐতিহ্যবাহী বাউল সঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি, ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র এবং ইফতার এসবগুলোই ইউনেস্কো স্বীকৃত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য। আপনি/আপনারা অস্বীকার করলেও এগুলো বাংলার বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবেই থাকবে।

শুভ নববর্ষ।

কেপি ইমন

আমি আগেও Kishor Pasha Imon এর একাধিক বই পড়েছি। তার গল্প 'মানুষ জিতবেই' আমার অন্যতম পছন্দের একটি গল্প। এটি প্রায়শই আমি পড়ি। হঠাৎ একদিন গল্পটি খুজে না পেয়ে আমি লেখককে ইমেইল করি গল্পটির জন্য। এই গল্পটি আমার আশেপাশের অনেকজনকে আমি জোর করে পড়িয়েছি। এই গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তানভীর ফুয়াদ রুমি আরেকটি গল্প লিখেছিলেন, যে গল্পটি বইপোকা গ্রুপে পড়ার পর আমি কেপি ইমনের লেখার সন্ধান পাই। তানভীর ফুয়াদ রুমির কলম চি র দি নে র মতো ব ন্ধ হয়ে গেল এটি ভাবলে মন খা রা প হয়।
সুদীপার নিকট থেকে কেপি ইমনের ছাড়পোকা বইটি নিয়ে মুক্তাঞ্চল সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র, হবিগঞ্জ এর অনেক সদস্য পড়েছে, সবাই বইটি নিয়ে ভালো রিভিউও দিয়েছে। এই বইয়ের '৩৬০° ঘুরে মা থা টি নিচে পড়ে যাবে' এমন একটি লাইন আমরা আমাদের আড্ডার সময় ফা জ লা মো করে অনেকবার ব্যবহার করেছি, বিশেষ করে ইমাদ এটি বেশি ব্যবহার করতো।
কেপি ইমনের ফেইসবুক পেইজ, টেলিগ্রামের গ্রুপ সব জায়গায় যুক্ত থাকলেও কোনো এক আশ্চর্য কারণে আমি জানতাম না এ বছর মেলায় কেপির কি বই বের হয়েছে। ইদানীং থ্রিলার তেমন পড়া হয় না, প্রবন্ধের বই বেশি ভালো লাগে। তাই এই মেলাতে কেপি ইমনের কি বই বের হয়েছে তাও নিজে থেকে সার্চ দিয়ে দেখা হয় নি।
কিন্তু রকমারিকে ধন্যবাদ, পরেরদিন মেলায় গিয়ে প্রথম কাজ আমার নালন্দায় যাওয়া, কেপির বই কিনা।

পাঠক হিসেবে বইয়ের পাতার কোয়ালিটি কেমন চাই?

যেন হাইলাইটার দিয়ে এক পৃষ্ঠায় হাইলাইট করার কারণে হাইলাইটারের কালি অপর পৃষ্ঠায় না যায়। উভয় পৃষ্টা সমানভাবে হাইলাইট করার পরেও যেন পৃষ্ঠাদুটো পূর্বের মতোই সুস্থ ও জীবিত থাকে৷ কারণ পাঠক হিসেবে আমি প্রচুর হাইলাইট করি, বিশেষ করে প্রবন্ধের বইগুলো, হাইলাইট করে পড়তে ভালো লাগে।

নিরপেক্ষ মিডিয়া!

বাংলাদেশর নিরপেক্ষ মিডিয়ার সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ:

.

১) বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান করতে চেয়েছিলেন রূপগঞ্জ থেকে নির্বাচন। তাকে প্রথমে সমর্থন দিয়েছিলো রংধনু গ্রুপ।
কিন্তু পরবর্তীতে রংধনু গ্রুপ কোনো কারণে বসুন্ধরা গ্রুপ থেকে সরে গিয়ে সমর্থন দেয় গাজী গ্রুপের চেয়ারম্যান পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীকে।
দ্বন্দ্বটা হলো বসুন্ধরা গ্রুপ বনাম গাজী ও রংধনু গ্রুপ।

.

বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন অসংখ্য মিডিয়া হাউজ রয়েছে৷ যাদের মধ্যে অন্যতম Bangladesh Pratidin, NEWS24, banglanews24.com ইত্যাদি।
অপরদিকে প্রতিপক্ষের মালিকানাধীন Protidiner Bangladesh, Green TV News ইত্যাদি।

প্রতিটি মিডিয়া হাউজ নিয়ম করে দিন তিনবেলা প্রতিপক্ষের নামে একের পর এক নিউজ পাবলিককে গিলিয়ে যাচ্ছে। তাদের পেইজে গিয়ে প্রতিপক্ষ গ্রুপের নাম লিখে সার্চ দিলে অসংখ্য অগণিত খবর চলে আসবে।
সবগুলোই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

.

২) Jamuna Television আজকের নির্বাচনের অনিয়মের খবর প্রকাশ করে দেশব্যাপী এক প্রকার হিরোতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে তারা আজকে যে আসনটি নিয়ে তাদের প্রায় সব নিউজ কাভার করেছে সেটি হলো ঢাকা-১ আসন। আর ঐ আসনে লাঙ্গল প্রতিকে নির্বাচন করেছে যমুনা গ্রুপেরই প্রার্থী। তাই যমুনা টিভিতে আজ শুধুমাত্র ঢাকা-১ আসনে নৌকা প্রতীকের অনিয়মের অসংখ্য খবর।
নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

.

প্রতিটি গ্রুপ নিজেদের মিডিয়া হাউজগুলো লালন পালন করে নিজেদের স্বার্থে যেভাবে খুশি ব্যবহার করার জন্য। আর আমরা আমজনতা হাততালি দিয়ে যাই। সরকারের মালিকানাধীন বিটিভি যেমন সরকারকে সার্ভ করে, তেমনি অন্যান্য মিডিয়াগুলোও বিটিভির মতোই চরিত্র; মালিকপক্ষকে সার্ভ করা। বিটিভি বা অন্য মিডিয়া সবার চরিত্র একই রকম।

নির্বাচন প্রত্যাখ্যান

যেখানে সরকার প্রধান কিংবা ক্ষমতাসীন দল পরিবর্তনের ০.০০১% সম্ভাবনা ও থাকে না, সেটিকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলা যায় না। সেই নির্বাচনের ও কোনো মূল্য নেই। একদলীয় একনায়কতন্ত্র এটি। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমিও এই একতরফা উদ্ভট নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলাম।

২০২৩

রাজনটী - স্বকৃত নোমান

অনেক দিন যাবত স্বকৃত নোমান ভাইয়ের লেখা পড়ব পড়ব করছি কিন্তু পড়া হচ্ছিলো না। তাই কিছুদিন আগে পাঠক সমাবেশ থেকে পুরো স্বকৃত নোমান ভাইকে বাসায় নিয়ে আসি। তারপর একবসায় পড়ে নিলাম উপন্যাস সমগ্র থেকে প্রথম উপন্যাস রাজনটী।
‘রাজনটী’ উপন্যাসটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজদের অনুপ্রবেশের পটভূমিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার একটি টেপস্ট্রি তৈরি করেছে। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে গুলনাহার নামক একজন বাইজিকে নিয়ে যাকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালে বিক্রি করে দিয়েছিল তার মা। তাঁর ভাগ্য উন্মোচিত হয় জাজিনগরের রাজধানী উদয়চলের প্রাণবন্ত শহরে। গুলনাহার যখন তাঁর সৌন্দর্য, নৃত্য এবং গানের জন্য পুরো রাজ্যে বিখ্যাত, যখন সে রাজ্যের মাইনেধারী রাজনটী, তখন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গুলনাহার এক অপমানে হতাশ হয়ে উদয়চলকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অজানা উদ্দেশ্য নতুন যাত্রা শুরু করে।
গুলনাহারের যাত্রার বর্ণনা, উদয়চলচাল থেকে হরিদশ্ব গ্রাম পর্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। লেখকের শক্তিশালী লেখায়, বিশেষত ভাষা এবং বাক্য নির্মাণে অনন্য দক্ষতায় উপন্যাসটি গ্রামীণ জীবন, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, রাজনীতি, ধর্ম এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের থিমগুলিতে প্রবেশ করে।

যদিও আমার কাছে দ্বিতীয় অংশের কাহিনিগুলো খুবই গতানুগতিক মনে হয়েছে তবুও লেখকের গল্প বলার দক্ষতা 'রাজনটী'কে একটি আকর্ষণীয় পাঠে পরিণত করেছে। অনেকটা এমন যে সহজেই গুলনাহারের গল্পে ডুবে যাওয়া যায়, গুলনাহারের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতির মধ্যে নিজেকে রিলেট করা যায়, মনে হয় ঐ সময়ের এই চিন্তাগুলো গুলনাহারের নয় বরং চিন্তাগুলো আমার, কষ্টগুলো আমিও পাচ্ছি। সর্বোপরি সহজেই গুলনাহারের সাথে পথ চলা যায়। প্রাঞ্জল ঝরঝরে সুখপাঠ্য উপন্যাস যে কাউকে সম্মোহিতের মতোই নিয়ে যাবে বইটির সর্বশেষ পৃষ্ঠায়।

অচিন গাছ

কথিত আছে, ভারতের আসাম রাজ্যের কামরূপ-কামাখ্যা হতে আগত একদল জাদুকর চোখের পলকে এই অচিন গাছটি এখানে লাগিয়েছিলেন। আর গাছটির নাম কেউ না জানার কারণে স্থানীয়রা একে “অচিন গাছ” হিসেবে নামকরণ করে। আবার অনেকের মতে, এক পীর সুদূর পশ্চিম দিক থেকে অপরিচিত এই গাছের চারা এনে রোপণ করেছিল। সেই কারণে এটি অচিন গাছ হিসেবেই পরিচয় লাভ করে। এমন রহস্যের কারণে অচিন গাছকে ঘিরে কৌতূহলী মানুষের আগ্রহের কমতি নেই।

.

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা গাছটির গোঁড়ায় এসে মানত করে দক্ষিণা দান করত। কালের বিবর্তনে গাছটির শাখা-প্রশাখা অনেকটা কমে গেলেও যুগ যুগ ধরে স্থানীয় পূর্ব পুরুষদের গাছটিকে ঘিরে পূজা আর্চনা করার রীতি এখনো রয়ে গেছে। প্রতি দুই বছর অন্তর সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে অচিন গাছকে ঘিরে পূজা আর্চনা করে।

.

অথচ চাইলেই গাছের প্রজাতি, নাম, কতদিন পূর্বে উৎপত্তি এসব নির্ণয় করা সম্ভব। জেলা প্রশাসন গাছের প্রজাতি নির্ণয়ের চেয়ে গাছের চারপাশে টাইলস লাগিয়ে এ কাজের পৃষ্টপোষকতায় মনযোগ বেশি বোধ হয়! সেলুকাস!
কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলায় দেখতে পাবেন গাছটি।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি

ঘটনা ১-
মোদির সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরের পূর্বে এবং সফরকালে জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে বিশাল বিক্ষোভ ও সহিংসতা হয়, পরে যা সারা সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলো। কারণ হিসেবে তারা মোদী সরকারের হিন্দুপন্থী মনোভাব এবং ভারতের মুসলমানদের প্রতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বৈষম্য উল্লেখ করে।
বিক্ষোভের এক পর্যায়ে সারা দেশে ১৭ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং প্রায় ৫০০ জন এর অধিক লোক আহত হন

.

ঘটনা ২-
শার্লি এবদো ম্যাগাজিনে নবীর ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ, দুটি ভবনে তা প্রদর্শন ও তাতে ফরাসি রাষ্ট্রপতির সমর্থন জানানোর প্রতিবাদে ২০২০ সালের অক্টোবরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বয়কট ফ্রান্স আন্দোলন শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁকেও বয়কটের ডাক দেয়া হয়। বাঙালিরা এমনকি দোকানের সামনে মাটিতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের ছবি রেখে দেয় যেন সবাই এটিতে পা দিয়ে যায়।

.

ঘটনা ৩-
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছেন। কিন্তু কোথাও কোনো বিক্ষোভ, কোনো আন্দোলন কিছুই নেই। অথচ স্বাভাবিকভাবেই মোদির সফরকালের মতোই উনাদের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা ছিলো কিংবা তারো বেশি। কিন্তু ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও নিশ্চুপ।
.
মানে আপনারা যাদের ডাকে হুজুগের মতো লাফিয়ে পড়েন সেই হেফাজতে ইসলাম বলেন কিংবা পীর সৈয়দ ফয়জুল করিমের হাতপাখা বলেন কিংবা নুরুল হক নূর বলেন, ইসলামরক্ষা কিংবা ধর্মীয় অনূভুতি কিচ্ছুরই ধার উনারা ধরেন না। উনারা করেন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি আর আপনারা উনাদের দাবার গুটি।

বৃষ্টি সর্বদা রোমান্টিক হয় না

ছোটবেলা থেকেই উড়নচণ্ডী স্বভাবের হওয়ায় বৃষ্টি আমার কাছে খুব কমদিনই রোমান্টিক লেগেছে।
নির্দিষ্ট কিছু বৃষ্টির দিন, যখন পাড়ার সবাই আয়োজন করে বৃষ্টিতে ভিজতাম, ফুটবল খেলতাম সেই কিছুদিন ব্যাতিত বৃষ্টির দিন আমি কখনোই উপভোগ করি নি।
আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের বৃষ্টি দুইরকমের মানুষদের কাছে খুব রোমান্টিক হয়ে ধরা দেয়। এক হলো যাদের বাসার বাইরে কোনো কাজ নেই, সারাদিন বাসায় শুয়ে থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। তারা বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি রান্না করবে, প্রিয় গান উপভোগ করবে।
আর অন্যরা হলো যাদের নিজস্ব গাড়ি আছে, যাদের পায়ে বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টির পর বাংলাদেশে রাস্তার কাদামাটি লাগে না, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও যারা দিব্যি নিজের দিনের কাজ চালিয়ে নিতে পারে কোনো বাধা ছাড়াই। বৃষ্টির ফোটা থেকে বাঁচতে তাদের কোনো দোকানের নিচে আশ্রয় নিতে হয় না, পায়ে কাদা না লাগার জন্য রাস্তায় লাফিয়ে চলতে হয় না।
আমরা যারা মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত, যাদের দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতে হয়, স্বভাবে কিংবা অভাবের তাড়নায় আমাদের জন্য বৃষ্টি অনেক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিনিয়ত। যারা রাস্তায় ঘুমোয় তাদের দূর্ভোগ তো অকল্পনীয়। একবার চিন্তা করুন যারা বিভিন্ন সেক্টরের ডেলিভারির কাজ করে তাদের কথা। বৃষ্টি তাদের কাছে বোধহয় কখনোই রোমান্টিক নয়।
.
শহরের বৃষ্টি রোমান্টিক নয়। যে শহরে বৃষ্টি হলে হাটু পর্যন্ত পানি দিয়ে রাস্তায় হাটতে হয় সেই শহরে বৃষ্টি রোমান্টিক হতে পারে না।

আল কায়দার খোঁজে - মহিউদ্দিন আহমদ

‘ক্লিকবেইট টাইটেল’ মিডিয়া সেক্টরের জনপ্রিয় এই টার্মটির খুব ভালোভাবে ব্যবহার হয়েছে এই বইয়ের নামকরন ও প্রচ্ছদে। বইয়ের নাম ও প্রচ্ছদ দেখে যে কেউ ভাববেন আল কায়দা সম্পর্কে হয়তো বইটি লেখা। কিন্তু প্রথমদিকের কিছু পৃষ্ঠা ব্যাতীত পুরো বইটিতে বাংলাদেশে আল-কায়দার অস্তিত্ব নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরির সময় গ্রেফতার সাংবাদিকদের বন্দি জীবন ও তার পরবর্তী তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে।

.

তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি জোট সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরীক দল ছিলো জামায়াতে ইসলামী। জোট সরকারের সময়ে রাস্তায় স্লোগান দেয়া হতো 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান'। সরকারও বোধহয় বাংলাকে আফগান বানাতে চেয়েছিলো, তাই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে আল-কায়েদা ও তালেবানের মতো জঙ্গীগোষ্ঠীদের। ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছে বাংলাদেশের ভূখন্ড। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ও ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ বাংলাদেশকে 'কোকুন অব টেরর' বা সন্ত্রাসবাদের গর্ভ বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় আল কায়েদা ও তালেবানের অস্তিত্ব নিয়ে বাংলাদেশে এসে তথ্য অনুসন্ধান করতে চাইলে চ্যানেল ফোর এর দুই সাংবাদিক জাইবা মালিক ও ব্রুনো সরেনতিনোকে বার বার আবেদনের পরেও ভিসা দেয় নি তৎকালীন সরকার। পরবর্তীতে পরিচয় গোপন করে টুরিস্ট ভিসায় এই দুই সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন। অনুসন্ধানকালে গ্রেফতার করা হয় ঐ দুই বিদেশী সাংবাদিকসহ তাদের স্থানীয় সহযোগী সাংবাদিক সালিম সামাদ ও প্রিসিলা রাজকে।

.

শাহরিয়ার কবিরের উপরে বর্তমান সময়েও একশ্রেণীর মানুষের ভীষণ ক্ষোভ। জননী জাহানারা ইমামের সাথে সামনের সাড়ি থেকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও গণ-আদালতের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা। এই লোকদের কারনেই এদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব হয়েছে। তাদের পিয়ারে আমির গোলাম আযম, নেতা মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এর মতো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড়া করানো হয়েছে। যেহেতু তৎকালীন বিএনপি সরকারের অন্যতম শরীক দল ছিলো জামায়াতে ইসলামী তাই সরকার ক্ষমতায় এসে এই লোকদের ফাঁসাতে চেয়েছে। বন্দি সাংবাদিক সালিম সামাদের সাথে অন্য একজন বন্দির কথোপকথনঃ

- সাংবাদিক সাহেব, ওরা কিন্তু শাহরিয়ার কবিরের নাম বলতে বলবে, বলবে ওয়ান সিক্সটি ফোরে স্টেটমেন্ট দেন যে সে-ই হলো এই ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু।
- এটা কি করে সম্ভব? উনি এর সাতেও নাই পাঁচেও নাই!
- সেইটা ইম্পর্ট্যান্ট না। গভর্মেন্ট তারে এই কেসে ঢুকাইতে চায়।

পরে বইয়ে আমরা দেখতে পাই ঠিকই শাহরিয়ার কবিরের নামে স্বাক্ষী দিতে অমানসিক নির্যাতন করা হয় বন্দিদের উপর। একজন বন্দি প্রিসিলা রাজকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে তার নিকট থেকে জোরপূর্বক মিথ্যা স্বাক্ষী নেয়া হয় এবং শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে সুযোগ পেয়ে বন্দি অবস্থায়ই প্রিসিলা রাজ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বলেন, শাহরিয়ার কবিরকে যুক্ত করে দেয়া তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না। পুলিশ তাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ও প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে। তিনি এই বক্তব্য প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

একইভাবে সরকার নিজের আক্রোশ মেটাতে বিনাঅপরাধে আরেক বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকেও এই মামলায় গ্রেফতার করে।

.

একুশ শতকে জন্ম, আমরা যারা বুঝতে শেখার পর থেকে চোখের সামনে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামিলীগ শাসনামল দেখেছি, তাদের জন্য এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এই কারণে যে পূর্ববর্তী সরকার কিভাবে জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, কিভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে এবং মিডিয়ার কণ্ঠ কিভাবে চেপে রেখেছে তা জানা যাবে এই বইটি পড়ার মাধ্যমে। আড়াইশো পৃষ্ঠার বইটির পুরোটি শেষ করেছি এক বসায়।

.

মনে বার বার প্রশ্ন আসছে, এই বইয়ের লেখকের নাম মহিউদ্দিন আহমদ কেন? সালিম সামাদ নয় কেন?

‘যে রিপোর্টটি হবে, অ্যালেক্স হবে তার মূল অথর। আমি অথর না। অথবা বলা চলে আমি হলাম ইনফরমার। রিপোর্টে হয়তো আমার নাম উল্লেখ করা হবে।’ বইয়ের কোনো এক পটভূমিতে লেখা এই বাক্যগুলোর যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে কি এই বইয়ের লেখকের নামের ক্ষেত্রেও?

.

বইঃ আল-কায়দার খোঁজে
লেখকঃ মহিউদ্দিন আহমদ
প্রকাশনীঃ বাতিঘর
বকবকঃ মুশফিকুর তুহিন

যত দোষ কবির সুমনের

ঢাকায় আয়োজিত 'লেটস ভাইব উইথ অনুভ জেইন’ কনসার্টের টিকেটের সর্বনিম্ন মূল্য ছিলো ১৮০০ টাকা, 'লেটস ভাইব উইথ তালপাতার সেপাই' কনসার্টের সর্বনিম্ন মূল্য ছিলো ১৫০০ টাকা।
কয়েকদিন পর অনুষ্ঠিতব্য 'ম্যাজিক্যাল নাইট' (অর্ণব,অনুপম রায়, তালপাতার সেপাই ও মেঘদল) কনসার্টের টিকেট মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে ২৫০০ টাকা সাধারণ টিকেট ও ৪৫০০ টাকা ভিআইপি টিকেট।

.

অথচ কিছুদিন আগে ঢাকায় 'তোমাকে চাই-এর ৩০ বছর উদ্‌যাপন’ শিরোনামে কবীর সুমনের কনসার্টের টিকেট মূল্য ৭০০,১১০০ থাকায় ফেইসবুকে আয়োজকদের বাদ দিয়ে গায়ক কবীর সুমনের গোষ্ঠী উদ্ধার করা হয়েছিলো।

কালাপাহাড় ভ্রমণের বিস্তারিত

(যদি কেউ পরবর্তীতে যেতে চান পড়ে নিবেন)

.

বছর কয়েক আগে হামহাম ঘুরে এসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আর কখনো যাব না। হামহাম ঠিকই আর যাওয়া হয়নি কিন্তু দিন কয়েক আগে গিয়েছিলাম হামহাম থেকেও কয়েকগুণ কষ্টকর কালাপাহাড় ট্রেইলে ট্র্যাকিং করতে। স্থানীয়ভাবে এটিকে লংলার পাহাড় বলা হয়। কালা পাহাড় হচ্ছে বৃহত্তর সিলেটের সর্বোচ্চ বিন্দু বা চূড়া। এমনকি এটি বাংলাদেশের উত্তর অংশেরও সর্বোচ্চ বিন্দু।

.

অগ্রীম সতর্কবার্তা: রাতারগুল, জাফলং এর মতো সহজ ট্যুর এটি নয়। যতই কষ্ট হোক না কেন, বাংলাদেশের উত্তর অংশের সর্বোচ্চ বিন্দু জয় করার ইস্পাত-দৃঢ় মনোবল থাকলে তবেই আপনাকে স্বাগত। (এই কথা বলার কারণ ট্যুর শেষে আমাদের কি অবস্থা হয়েছিলো তার কিছু ছবি পরবর্তী পোস্টে থাকবে এবং পূর্ববর্তী পোস্ট সমূহে ট্যুরের আরো ছবি ও ভিডিও রয়েছে।।)

.

কিভাবে যাবেন ও ভাড়া:
হবিগঞ্জ থেকে:
হবিগঞ্জ - মৌলভীবাজার (বাস) - ১৪০ টাকা জনপ্রতি।

মৌলভীবাজার বাস স্ট্যান্ড - চাঁদনী ঘাট (অটো) - ২০ টাকা জনপ্রতি।
চাঁদনী ঘাট - কুলাউড়া (সিএনজি) - ৮০ টাকা জনপ্রতি (রিজার্ভ ৪০০ টাকা)।
কুলাউড়া - আজগরাবাদ (সিএনজি) - ৬০ টাকা জনপ্রতি (রিজার্ভ ৩০০ টাকা)।
.
ঢাকা থেকে:
ঢাকা - কুলাউড়া (ট্রেন) - ভাড়া এবং টাইম রেলসেবা এপসে/ওয়েবসাইটে দেখে নিবেন। বাসে আসতে চাইলে ঢাকা থেকে বাসে মৌলভীবাজার চলে আসবেন।
.
অন্যান্য:
১) কুলাউড়ার সব সিএনজি ড্রাইভার আজগরবাদ চিনে না, তাই বলবেন রবির বাজারের দিকে যেতে হয়।
২) আজগরাবাদ বাজারে এসে যেকোনো দোকানে বলবেন কালাপাহাড় যাবেন গাইড প্রয়োজন।
৩) আমরা ৬ জনের টিম গাইডকে ১২০০ টাকা দিয়েছিলাম।
৪) অবশ্যই অবশ্যই জনপ্রতি ২ লিটার পানি নিবেন।
৫) যেহেতু পাহাড়ের উঁচুনিচু রাস্তা পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে যত সম্ভব ভারী ব্যাগ ও জিনিসপত্র পরিহার করবেন।
৬) ৩ ঘন্টা অসম্ভব রকমের পরিশ্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় যেতে হবে, মানসিক প্রস্তুতি রাখবেন। ফিরতে ২.৫ ঘন্টার মতো লাগবে।
৭) যত সকাল সকাল সম্ভব আজগরাবাদ বাজার পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। অবশ্যই সকাল ১০ টার মধ্যে।
৮) আগের রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম, রাত্র ও সকালে পর্যাপ্ত খাওয়াদাওয়া করে শক্তি সঞ্চয় করে নিবেন। দুপুরের খাবার কখন কিভাবে খাবেন নিজেদের টাইমিং এর উপর ঠিক করে নিবেন।
৯) যেহেতু পাহাড় চড়বেন হালকা কাঁটাছেড়ার ফাস্ট এইড নিয়ে যাবেন।
১০) যদি মনে করেন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে অসম্ভব সুন্দর কিছু দেখবেন তবে হতাশ হবেন। এই যে এডভেঞ্চার করে এত উঁচু পাহাড় জয় করা এটাই আপনার ট্যুরের সার্থকতা।
১১) পলিথিন ও প্লাস্টিক সহ অন্যান্য আবর্জনা ফেলে পাহাড়ের পরিবেশ নষ্ট করবেন না।
.
আমাদের অভিজ্ঞতা:
আগের রাত্রে প্ল্যান করে আমরা পরেরদিন সকালে রওনা দেই। আগের রাত্রে ভাঁজা পোড়া খাওয়ার কারণে আমরা রাত্রে খাওয়া দাওয়া করি নি আবার আমাদের কারো রাত্রে দ্রুত ঘুমানোর অভ্যাস না থাকায় ঘুমাইওনি। সকালে হালকা নাস্তা করে রওনা দেই, দুপুরের খাবারের কোনো প্ল্যান রাখি নি। আমরা বিস্কুট সহ বিভিন্ন শুকনো খাবার শুধু নিয়েছিয়াম। আজগরাবাদ বাজার গিয়ে পৌছুতে দুপুর ১২ টা বেজে যায়। সাথে কাটাছেঁড়ার জন্য কোনো ফাস্ট এইড নেই নি। সবগুলোই ছিলো আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত, যা আমাদের কষ্ট কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। অবশ্যই সবগুলো বিষয় মাথায় রেখে প্ল্যান করবেন।

তারা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি

বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়ছিলাম হাসান মোরশেদ রচিত দাস পার্টির খোঁজে বইটি। মার্ক করা অংশগুলোতে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও তার ভাইকে নিয়ে লেখা অভিযোগগুলো গুরুতর।

ঘটনাটি ২০১৫ সালের, বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালে। পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও উপজেলা সভাপতির বর্তমান অবস্থা জানতে একটু ঘাটাঘাটি করি।

.

দেখতে পাই, ঐ চেয়ারম্যান এখনো বহাল তবিয়তে আছেন। প্রায় ৯ বছর পর ২০২২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া আজমিরীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলে আবারো তাকে আগামী তিন বছরের জন্য সভাপতি করে নতুন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। আরো দেখতে পাই, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন সভাপতি মিজবাহ উদ্দীন ভুঁইয়া ছাড়া আর কোন প্রার্থীর নাম পাওয়া যায়নি তখন।

.

বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনতার বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জগৎজ্যোতি দাস এর সহযোদ্ধা ইলিয়াস চৌধুরী ও বইটির লেখক হাসান মোরশেদের উপর ২ কোটি টাকার মানহানি মামলা করেছিলেন এই উপজেলা সভাপতি।

.

২০২০ সালে আজমিরীগঞ্জ উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈয়বুর রহমান খান বাচ্চুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ঐ উপজেলা চেয়ারম্যান ও তার ভাই উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতির যুদ্ধাপরাধের তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে তারা বলেছিলেন, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আজমিরীগঞ্জে লঞ্চ যোগে প্রচারণায় এসেছিলেন সে সময় মিজবাহ উদ্দিন ভুইয়া ও তার ভাই নূরুল হক ভূইয়া আজমিরীগঞ্জে বঙ্গবন্ধুকে লঞ্চ ঘাটে ভিড়াতে বাধা প্রদান করে। পরে বঙ্গবন্ধু লঞ্চ থেকে ভাষন প্রদান করেন এবং জনতা ও নৌকা মাঝি তার ছেলের সহযোগিতায় মাজার জিয়ারত করে আজমিরীগঞ্জ ত্যাগ করেন। লঞ্চে সদ্য সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মহোদয় সফর সঙ্গী ছিলেন।
এতো গুরুতর অভিযোগের পরেও ২০২২ সালে তাকে পুণরায় সভাপতি করা হয়!

.

স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্য ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের ছাপ নিয়ে মানচিত্র তৈরির কাজে আমি ও আমার দল পুরো হবিগঞ্জের সবগুলো উপজেলার আনাচেকানাচে গিয়েছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলেছি, তাঁদের আক্ষেপ শুনেছি।
এইতো গত বছর জুলাই মাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস চৌধুরী মারা যান। যার সাথে দেখা না করতে পারার আক্ষেপ আর কখনোই পূরণ হবার নয়!
এখন জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, মামলার কি হয়েছিলো? বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস চৌধুরী কি স্বাধীন দেশে অনেকগুলো মামলা মাথায় নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন?
ভাবতেই নিরাগ লাগে যে অন্য সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো হয়তো মৃত্যুর আগে তাঁরও দেশের প্রতি তাঁর একবুক জমা আক্ষেপ আর তীব্র অভিমান ছিলো, যেগুলো নিয়েই তিনি পরপারে পাড়ি দিয়েছেন।

মুখোশ

মাস্টারবেশনের পর অপরাধবোধ ও নিজের প্রতি ঘৃণায় গা গুলিয়ে ওঠে। এটি যতটা না বীর্য দেখে নিজের ক্ষতির চিন্তা করে, তার চেয়ে বেশি বীর্যত্যাগের পূর্বে করা নিজের চিন্তাগুলোর জন্য।

যে চিন্তাগুলো প্রকাশের অযোগ্য, যেগুলো প্রকাশ হলে বাংলাদেশের সমাজ আমাদের চিহ্নিত করবে বিকৃত হিসেবে। এমনিভাবে সবার নিজের মনেমনে করা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ হতে থাকলে হয়তো সমাজ এর ধরন পরিবর্তন হয়ে যেতো।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ মনে যা চিন্তা করে, কর্মে তার শতভাগ প্রতিফলিত করতে পারে না। অনেক সুশীলরা যেমন টকশোতে নীতিগর্ভ আলোচনা করে কিন্তু বাস্তবে জীবনে চলার পথে সে মহাভন্ড, তেমনি অসংখ্য মানুষ সমাজে ভদ্র মুখোশ ধারণ করে কিন্তু গোপনে সে একজন খারাপ মানুষ। লালসালু উপন্যাসের মজিদ কিংবা হাসুনির বাপের চরিত্রের এ সংখ্যাটা অল্প বিধায় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে।

যদি সবাই সবার মাইন্ড রিড করতে পারতো বা যদি একান্তে চিন্তা বলতে কিছুই না থাকতো তবে বর্তমান সময়ের মতো সমাজে ভালো মানুষ, খারাপ মানুষ এসব শ্রেণিভেদ হতো না। তখন সবকিছু ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার কারণে মানুষের কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকতো না।

অধিকাংশ মানুষ নিজের মনে অনেকসময় জঘন্য সব কল্পনা করে যার কিছুই সে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকাশ করে না। একজন মনে যাই চিন্তা করুক, যত খারাপ কিছু তার মাথায় আসুক না কেন সে তৎক্ষনাৎ সেসব চিন্তা দূর করে সবার সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করে এবং নিজের কাজেও সেটি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। খারাপ কাজ যে সে একদমই করে না, তেমনটা কিন্তু নয়। কিন্তু সে মেইন্টেইন করার চেষ্টা করে। এ প্রকৃতির মানুষই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি এবং তারাই ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে পরিচিত।

.

আবোলতাবোল বকবক

১ মার্চ

রাত ২ টা ৪৫ মিনিট

পূর্ব ভাটারা, ঢাকা।

সম্পর্ক

অধিকাংশ সম্পর্ক মানে স্বার্থ। সম্পর্ক মানে হতে পারে বর্তমান সময়ে কোনো কারনে আপনাকে তার প্রয়োজন কিংবা সে জানে ভবিষ্যতে আপনাকে তার প্রয়োজন হবে। এবং তদ্বিপরীত।

কারোর যদি আপনার সাথে কোনো স্বার্থ থাকে, তবে আপনাকে এফোর্ট দেয়া লাগবে না, সম্পর্ক এমনিতেই মধুর থাকবে।

আর যদি কোনো স্বার্থ না থাকে, তখন এফোর্ট, প্রায়োরিটি এইসব টার্ম সামনে আসবে।

যখন কাউকে আর কারো বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে হবে না, তখন একজন অন্যজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে, এটাই সত্য। এফোর্ট, প্রায়োরিটি সবকিছুই নগন্য। সব সম্পর্কে স্বার্থই মূখ্য। আশেপাশে তাকালেই দেখা যায় অধিকাংশ সম্পর্কচ্ছেদ এর মূল কারণ স্বার্থ।

কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া বিষয়টা রক্তের বন্ধন, আত্মার বন্ধন অধিকাংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সত্য।

২০২২

মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ - মোজাফ্ফর হোসেন

১. মানুষের মাংসের চাহিদা বাড়ার পর রাজধানীর এলিট অঞ্চলে হোটেলগুলোতে মানুষের মাংস বিক্রি করা হয়।

হোটেলগুলোতে খাওয়া যায় মানুষের মাথার মাংস, হাড়ের নেহারি, শিশুর মাংসের হাড় চিবিয়ে খাওয়া যায়, চর্বিওয়ালা গোশত পছন্দ করলে মোটাগোটা মেয়েমানুষের বুকের ও রানের মাংস ও পাবেন, কিচেনের পেছনের স্টোরে কাটা মাথা দেখে অথবা ছবি দেখে পছন্দ অনুযায়ী মানুষের মাংস ও খেতে পারবেন।

২. কি? কাল্পনিক লাগলো? অবাস্তব?

বইয়ের ফ্ল্যাপেই লেখা আছে এ গ্রন্থের গল্পগুলোয় লেখক বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অবাস্তব এবং পরবাস্তবতার খোলসে লিখেছেন। উপরের মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁর যে বর্ণনা সেটা অবাস্তব লাগার পর ৩ ও ৪ নাম্বার প্যারায় এবার গল্পের আরো কয়েকটা লাইন শুনাই।

৩. মানুষের মাংসগুলো সিরিয়া থেকে আসছে। সবাই যুদ্ধাহত। ইসরায়েল ফিলিস্তিনি শিশুদের মাংস থেকে এক ধরনের আচার তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে, এত দাম যে, কারো একার পক্ষে কিনে খাওয়া সম্ভব না। বিশ্বসংঘ থেকে শুরু করে বড় বড় এনজিওর মিটিংয়ে নাকি পরিবেশন করা হয়। আরবের শেখরাও এর বড় ক্রেতা। ওদিকে ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষের কারণে বাবা-মায়েরা শিশুদের বিক্রি করে দিচ্ছে। বেশিরভাগই হাড্ডিসার, এই কারণে চাহিদা কম। চীন কিনে নিয়ে প্যাকেটজাত করে কম দামে বাজারে দিচ্ছে।

পথশিশুদের মাংস এসব হোটেলে বেশি ব্যবহার করা হয়।

এত দাম দিয়ে রোজ মানুষের মাংস টাকাওয়ালা ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ীরা খায়। বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে অর্ডার আসে। শৌখিন মধ্যবিত্তরাও আসে, জন্মদিনে কিংবা চাকরির প্রমোশন হলে। কেউ কেউ বসকে খুশি করতে পার্সেল করে।

৪. সামনের টেবিলে কয়েকজন দেশি বিদেশি মিলে মিটিং সারছে। চোখে পড়ে এক ভদ্রলোকের হাতে একটা ফাইলে লেখা, হিউম্যান রাইটস ইন স্লামস।

মিট হিউম্যান মিট রেস্তোরাঁয় এভাবেই নাকি রোজ রোজ সমাজ বদলের তর্কে বসে বিত্তবান মানুষেরা, প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে মিটিং করে দেশি বিদেশি সংগঠনগুলো। বিল দেওয়ার সময় ম্যানেজার হাসতে হাসতে আমাদের বলে, আবার আসবেন স্যার! আমাদের মানুষের মাংসে কোনো ভেজাল নেই।

৫. কি? ১ পড়ার পর যেমন অবাস্তব লেগেছিলো, ৩ ও ৪ পড়ার পর বাস্তবতার সাথে কিছুটা মিল পেয়েছেন?

ফ্ল্যাপেই লেখা আছেঃ গল্পহীনতার গল্প নয় এগুলো; তবে সতর্ক মনোযোগে গল্প খুঁজতে গেলে পাঠক খেই হারাবেন। কারণ বাস্তবতা এবং পরবাস্তবতার একই আয়নায় মোজাফ্ফর তাঁর গল্পগুলোকে হাজির করেছেন। যেখানে সমাজের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা এবং নৃশংসতার নানা চিত্র কখনো তীব্র শ্লেষে, কখনো রূপকের মাধ্যমে উঠে এসেছে।

৬. বইটি নিয়ে যখন ঢাকা বাতিঘর থেকে বের হই সেদিন সারাদেশে ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে পরিবহন ধর্মঘট ছিলো। শুধুমাত্র বিআরটিসি বাস রাস্তায়, বই নিয়ে বাইরে আসার সাথে সাথেই সামনে দেখি একটা বিআরটিসি বাসে এতো পরিমান মানুষ ঝুলে আছে যে একটা ব্রেক কষলেই একদুইজন ছিটকে পড়বে, প্রাণহানি ও ঘটতে পারে।

তখন আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলো না যে মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ বইয়ের ভেতর কি লেখা আছে! এই দৃশ্য দেখার পর আমার পাশে থাকা বন্ধু ফাহিমকে বলেছিলাম এ শহরটাই একটা মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ।

৭. কলেজের পাঠ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল গল্পের পাঠ পরিচিতিঃ

বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-কর্মবেদনা যুক্তিগ্রাহ্য সাম্যতাত্ত্বিক সৌকর্যে উচ্চারিত হতে থাকে, 'আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক।' মাছের কাঁটা, পাতের ভাত-যা দিয়ে ইচ্ছে করলেই বিড়ালের ক্ষিধে দূর করা যায়। লোকজন তা না করে সেই উচ্ছিষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলে দেয়। যে ক্ষুধার্ত নয় তাকেই বেশি করে খাওয়াতে চায়। ক্ষুধাকাতর-শ্রীহীনদের প্রতি ফিরেও তাকায় না। এমন ঘোরতর অভিযোগ আনে বিড়ালটি। বিড়ালের 'সোশিয়ালিস্টিক', 'সুবিচারিক', 'সুতার্কিক' কথা শুনে বিস্মিত ও যুক্তিতে পর্যুদস্ত কমলাকান্তের মনে পড়ে আত্মরক্ষামূলক শ্লেষাত্মক বাণী-বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে এবং তিনি সেরকম কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সাম্যাবাদবিমুখ, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের অধিকারবিষয়ক সংগ্রামের কথা কী শ্লেষাত্মক, যুক্তিনিষ্ঠ ও সাবলীল ভাষা ও রূপকাশ্রয়ে উপস্থাপন করেছেন তা এ গল্প পাঠ করে উপলব্ধি করা যায়।

.

উপরের পাঠ পরিচিতি ভালো করে পড়ে থাকলে মোজাফফর হোসেন এর 'মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ' বইটির গল্প 'শেষ মাথাটি কাটাপড়ার আগে' এর সম্পর্কে কিছু বলা লাগবে না।

গল্পটি পড়ে নিন, আপনার মাথাটি এখনো কাটা না পড়ে থাকলে গল্পটি অনুভব করতে পারবেন।

গোড়ায় গলদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো আদর্শ মানুষ তৈরির কারখানা, আর শিক্ষক হলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর।

ঐ যে আদর্শ মানুষ তৈরির কারখানা, আর আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেশে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে এবং কয়জন শিক্ষক শিক্ষকতার পেশায় এসেছেন?

.

২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ শিক্ষায় ৯৫% বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২০ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ হাজার ৩৬৩ বেসরকারি মহাবিদ্যালয়, ৪ হাজার বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ, ৭ হাজার ৫৯৮টি বেসরকারি মাদ্রাসা, ৫৫৩টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন, ৯ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ও ৯০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর ১% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও কি মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে?

.

ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল, কলেজ,মাদ্রাসা তৈরি করা হচ্ছে। যার ৯৯.৯৯% প্রতিষ্ঠা করা হয় যে উদ্দেশ্যে, সেটা হলো ‘ব্যবসা’। আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হচ্ছে সেটা হলো ‘কনফার্ম জান্নাতি হওয়ার লোভ + সামাজিক মানসম্মান বৃদ্ধির লোভ’। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো পেশায় সুবিধা করতে না পেরে শেষ পছন্দ হিসেবে মানুষ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

.

সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে দেশ শিক্ষায় ৯৫% বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল, যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিই মহৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেনি, যে দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের পণ্য, সে দেশ দূর্নীতিগ্রস্থ, অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য এবং ঐ দেশের অধিকাংশ মানুষ মেধাহীন, মেরুদন্ডহীন, পঙ্গু, নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা করতে না পারা সার্টিফিকেটধারী গাধায় পরিণত হবে সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

গোড়ায় গলদ!

ঘুমকাতুরে প্রতি সন্ধ্যা

সন্ধ্যার পরে একটাই লক্ষ্য থাকতো, ঘুমোতে যাওয়া।

বিকালে খেলাধুলা করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরতাম। ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে থাকলেও মায়ের ভয়ে বই নিয়ে বসে থাকতে হতো। কখনো বইয়ের উপরেই ঘুমিয়ে গেলে আবার মায়ের বকুনিঝকুনি খেয়ে চোখ খুলতাম। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সজাগ থাকার চেষ্টা করতাম। কতো রাত যে না খেয়ে ঘুমিয়েছি, না খেয়ে ঘুমানোর জন্য ঠ্যাঙানো খেয়েছি তার ইয়াত্তা নেই।

এতো ঘুমের কারন একটাই ছিলো, শহরের অলিগলিতে টইটই করা, ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, লুকোচুরি, ভুত চালান সহ বিভিন্নভাবে নিজের শরীরের তুলনায় কয়েকগুণ শক্তি প্রতিদিন খরচ করা।

ডিজিটাল ডিভাইস নেই, সারাদিনের কাজ রাত্রে সমাপ্ত করার তাড়না নেই, আগামীকালের চিন্তা নেই। সন্ধ্যার পরে শুধু কাজ মা'কে খুশি করার জন্য পড়া এবং পড়া শেষ হলেই ঘুম। এর বাইরে অন্য কোনো চিন্তাই নেই।

যখন পড়া ছুটির সময় হতো, ঘুমানোর সুযোগ পেয়ে যেতাম, তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হতো।

প্রতিদিনের বহুল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, আহা! বিছানায় মাথা রাখা মাত্র সেই শান্তির ঘুম।

স্টুডেন্ট হাফ পাস

"ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের ‘আইডেন্টিটি কার্ড’ দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ‘কন্সেসনে’ টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও ‘কন্সেসন’ দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে

কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ ‘কন্সেসন’ দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধাসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ ‘কন্সেসন’ দিতে হইবে।"

এটি ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবির প্রথম (১ এর ঢ) দাবী ছিলো। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক ঐক্যে গঠিত হওয়া ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে নিম্নোক্ত ১১-দফা দাবি ঘোষণা করে।

১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান, ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি এগুলো পাঠ্যবইয়ে পড়তে পড়তে বড় হয়েছি। আরো পড়েছি

"বাঙালি বীরের জাতি, অধিকার আদায়ে পিছপা হয় না, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেয়।"

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১,

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, দেশ স্বাধীন হয়ে গেল ৫০ বছর হলো।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে যে দাবীতে পরাধীন দেশে আন্দোলন করা হয়েছে সে দাবিতে ২০২১ সালে স্বাধীন দেশে আজ ও রাস্তায় আন্দোলন করতে হচ্ছে।

.

কি দেখার কথা কি দেখছি

কি শোনার কতা কি শুনছি

কি ভাবার কথা কি ভাবছি

কি বলার কথা কি বলছি

৩০ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুজছি।

গানের লাইনগুলো আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কতোটা বাস্তব মনে হয়!

তুমি

হুড়মুড়িয়ে উঠে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্যাম্পাসে গিয়ে ক্লাস এটেন্ড করা পাবলিক আমি।

ফেঁপে উঠা পেট নিয়ে চার ঘন্টা পর হোস্টেলে পৌঁছে প্রবল বেগে মূত্র বিসর্জন দেয়ার পর মনে যে পরম প্রশান্তি লাভ করি, বিশ্বাস করো তোমায় জড়াইয়া ধরলে আমি ঠিক তেমনি প্রশান্তি লাভ করি! অথচ হাজার বছর হইয়া গেল, তোমার দেখা পাই না!

ক্যাম্পাসের সামনে রিকশা না পাইয়া কাঠফাটা রোদে পনেরো মিনিট হাইটা হোস্টেলে আসা পাবলিক আমি। গোসলে গিয়া যখন তপ্ত শরীরে ঠান্ডা পানির স্পর্শ পাই, বিশ্বাস করো তোমায় জড়াইয়া ধরলে আমি ঠিক তেমনি প্রশান্তি অনুভব করি! অথচ হাজার বছর হইয়া গেল, তোমারে চোখের সামনে দেখি না!

সবচেয়ে খেতে ভালো, মানুষের রক্ত

ল্যাব ক্লাসগুলোতে যখন ক্লাস করতে ভালো লাগে না তখন হয়তো বাইরে যাই অথবা পিসিতে অনলাইনে Slither.io এই গেইমটা খেলে সময় কাটাই। গেইমটিতে সাপ সদৃশ প্রাণীটি আশেপাশে থাকা খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করে ধীরে ধীরে বড় হয়। কিন্তু চলার পথে যখন অন্য প্রাণীকে নিজের ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হত্যা করা হয় এবং ঐটাকে ভক্ষণ করা হয় তখন আপনি খুব দ্রুত বড় হয়ে যাবেন। এবং যত বেশি বড় হবেন তত রাজত্ব করতে পারবেন।

সাপটি যখন ছোট থাকে তখন সে নিজের পুরো শরীর দেখতে পায় কিন্তু যখন মোটামুটি বড় হয়ে যায়, তখন নিজের লেজ অর্থাৎ নিজের শুরুর জায়গাটা আর দেখতে পারে না, ডিসপ্লেতে জায়গা হয় না। যদিনা ইউটার্ন নেয়া হয়।

এই যে দুটি জিনিস আশেপাশে থাকা খাদ্যবস্তু খেলে ধীরে বড় হয় কিন্তু অন্য প্রাণী হত্যা করে ভক্ষণ করলে খুব দ্রুত বড় হওয়া যায় এবং বড় হয়ে আর নিজের শুরুর জায়গাটা না দেখা এগুলো থেকে কি আমরা মানুষরা ব্যতিক্রম?

তুমি

ধূসর রঙের ফোমের খন্ডতে যদি হাত দিয়ে দাগ দেয়া হয়, তবে ঐ দাগের অংশটুকুর রঙ অন্য অংশ থেকে গাঢ় হয়। ফোমে যদি অল্প পানি দেয়া হয় তবে এটা ধূসর থেকে অনেকটা কালো রঙ ধারণ করে। এভাবে ফোমে যদি ধীরে ধীরে পানি দেয়া হয় তবে ফোমটি পানি শোষণ করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌছায় যখন আর শোষণ করার সক্ষমতা থাকে না। আর এক বিন্দু পানির কণা দিলেও এটি ফোম ভেদ করে নিচে পরে যায়।

ঐ যে ফোমের ঐ অবস্থার মতোই তোমার প্রতি আমার আবেগ। একটু উনিশ-বিশ হলেই ফোম থেকে পানি পড়ার মতো আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে যাই।

হাত দিয়ে চাপ দিলে যেমন অনেক পানি একত্রে ফোম থেকে পড়ে যায় তেমনি তোমার সাথে মনোমালিন্য হলে কিংবা তোমার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে, আমার মন আকাশে ভারীবৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের এই আবহাওয়া দিনব্যাপী কিংবা কখনো কখনো ততোধিক সময় থাকে অপরিবর্তিত।

ইন্দুবালা ভাতের হোটেল - কল্লোল লাহিড়ী

ছোটবেলায় ইদের নতুন জামা কিনে এনে লুকিয়ে রাখতাম, যেন অন্য কোনো সমবয়সী কেউ দেখতে না পারে। ইদের আগে অন্যরা দেখলেই পুরাতন হয়ে যাবে যে!

.

আজ ইদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে ব্যাগে থাকা মুক্তাঞ্চলের সদস্যদের জন্মদিনের উপহারের জন্য নিয়ে আসা অনেকগুলো বই থেকে কল্লোল লাহিড়ী এর লেখা ইন্দুবালা ভাতের হোটেল বইটি পড়ে শেষ করলাম।

.

শেষ করার পর মনে হলো হায় হায় এইগুলো তো নতুন বই, উপহারের জন্য! বইটি কি পুরাতন হয়ে গেল!?

না কি বই চিরযৌবনা? বই পুরাতন হওয়ার শর্ত কি এটা ভাবতে ভাবতে একটি উপভোগ্য ট্রেনযাত্রার বাকি অল্পরাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছালাম।

.

কোথায় যেন পড়েছিলাম ভার্জিনিটি শুধুমাত্র একটি মানব সৃষ্ট সামাজিক বিশ্বাস, যা ব্যক্তিভেদে আলাদা হয়। কেউ ভার্জিন নাকি না- এটা কেবল সেই ব্যক্তি ব্যাতিত অন্য কেউ বলতে পারবে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে এরকম কোন পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে কারো First ভ্যা জা ই না ল সে ক্সে র হিস্ট্রি জানা যাবে!

ঠিক তেমনি বই পুরোনো নির্ধারণ করার বিষয়টাও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও বই এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়েছে।

.

কারো কাছে বই একজন পড়ার পরই পুরোনো মনে হয়, আবার কেউ বই এর কন্ডিশন দেখে পুরানো কিংবা নতুন নির্ধারণ করেন।

কেউ নিজে কোনো একটি বই একবার পড়লে ঐটাকে পুরানো ভেবে থাকেন, আবার কারো কাছে কোনো কোনো বই অনেকবার পড়ার পরেও চিরযৌবনা মনে হয়।

একজন কমলালেবু - শাহাদুজ্জামান

জীবনানন্দের পুরো ব্যক্তিগত জীবন যেন ছিল তাঁর লেখা চরণদ্বয় 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে, বড়ো বড়ো নগরীর বুক ভরা ব্যাথা' এর মতোই।

'একজন কমলালেবু' পুরো বইটি পড়তে পড়তে বিষন্নতায় ছেয়ে যাওয়া হৃদয় নিয়েই যেন হেঁটেছি জীবনানন্দের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে।

.

পড়েছি জীবনে একটু অন্যমনস্ক হলে জীবন কাউকে ছাড় দেয় না। দেখেছি জীবনানন্দ জীবনে যা কিছুকে মূল্যবান মনে করেছেন, চোখের সামনে সেগুলোর ধূলিকণা হয়ে যাওয়া। গভীর অসহায় বোধ করেছি জীবনানন্দের সাথেই। জীবনের এই অসহায়ত্ব, এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য যেন আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করছি!

.

যে জীবনানন্দের ছবি আমার মনে আঁকা ছিলো, তাকে জেনেছি আরো গভীরভাবে। প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের ভেতরও যিনি সর্বদা খাড়া রেখেছিলেন তাঁর কবিতার মাস্তুল। মুখ থুবড়ে পড়ে পড়তেও লিখে গেছেন কবিতা, জীবনানন্দের প্রিয় শহর বরিশালের কথ্যভাষায় যাকে বলা যায় 'জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা'। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের স্বাধীনচেতা ভাবটা এমন যে, 'ক্যান ঠেকলাম কিসে আমি কারো মাহা (মাখা) তামাক খাই?'

.

কলেজ জীবনে 'ক্রাচের কর্নেল' দিয়ে শাহাদুজ্জামানের লেখার সাথে পরিচয়, পড়ার পর ঘোর লাগা অবস্থায় ছিলাম কয়েকদিন। অতঃপর পড়লাম লেখকের 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' নামক অসাধারণ একটি গল্পগ্রন্থ। আর আজ পড়ে শেষ করলাম একজন কমলালেবু বইটি।

.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দের দ্বিতীয় বই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'। তেমনি জীবনানন্দকে নিয়ে শাহাদুজ্জামানের লেখা 'একজন কমলালেবু' বইটি পড়েও আমার উপলব্ধি 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'।

.

বইটির সন্ধান দেয়ার এবং যোগান দেয়ার জন্য ধন্যবাদ Debjani Kar.

ট্রেন টু পাকিস্তান - খুশবন্ত সিং

উপন্যাসটি সম্ভবত লেখক খুশবন্ত সিং এর লেখা প্রথম বই। সুজন চৌধুরীর করা অনুবাদটি ছিলো অত্যন্ত সাবলীল। মুক্তাঞ্চল আয়োজিত 'কী বই পড়ব' সিরিজের ৪র্থ পর্বে নিজের প্রিয় ১০ টি বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বইটির কথা বলেছিলেন কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক শ্রদ্ধেয় Afsana Begum. পরেরদিনই গিয়ে বইটি কিনে আনি।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার বিভৎস্য রুপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন বইটিতে। পূর্বের দিন যে নিরীহ লোকটি তাঁর প্রতিবেশি বিধর্মী ভাইয়ের জন্য চোখের অশ্রু বিসর্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলো নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁদের জীবন রক্ষা করবে, সেই একই লোক অন্যের উস্কানিতে পরেরদিন ঐ বিধর্মী প্রতিবেশীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার চিরায়ত গল্প লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বইটিতে।

লেখক এই করুণ কাহিনির সমান্তরালে দাড় করিয়েছেন শিখ জুগগাত সিং এর সাথে মুসলিম ইমামের মেয়ে নুরুন এর প্রেমকাহিনী। বেপরোয়া জুগগাত সিং নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁর স্বজাতি শিখদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানগামী মুসলমান শরনার্থীদের ট্রেন, যে ট্রেনে পাকিস্তান যাচ্ছিলো তাঁর প্রেমিকা নুরুন।

.

“একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা গুলি ছোড়া হল। লোকটা কেঁপে উঠল এবং পড়ে গেল। তাকে নিয়ে দড়িটা মটমট করে ছিড়ে পড়ল। ট্রেনটা তার ওপর দিয়েই চলে গেল। এবং এটা চলে গেল পাকিস্তানে...”

.

ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে বইটি পড়েছিলাম, হয়তো পরিবেশের কারণে বইটি আরো ভালো লেগেছে।

অক্ষয় মালবেরি - মণীন্দ্র গুপ্ত

মণীন্দ্র গুপ্ত যখন গ্রাম বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা করেন তার আত্মজীবনী গ্রন্থের মাধ্যমে তখন পড়তে পড়তে আমার মনে হয় এ চিত্রটি আমার বড্ড পরিচিত, ঠিক এই দৃশ্যপটে আমি বেড়ে উঠেছি।

তিন খন্ডের আত্মজীবনীর প্রথম দুই খন্ড পড়েছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কিছু কিছু জায়গা এতো ভালো লেগেছে যে ছবি তুলে সবার সাথে শেয়ার করেছি।

কিন্তু বিপত্তি বাধে তৃতীয় খন্ড পড়তে গিয়ে। পড়তে পড়তে বিরক্তি আসে। আবার পড়ার চেষ্টা করি। অনেকগুলো জায়গা চোখ বুলিয়ে বাদ দিয়ে দিয়ে বইটির তৃতীয় খন্ড শেষ করেছি। কোন কারণে প্রথম দুইটি খন্ড একদম মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ার পরে তৃতীয় খন্ড আমার একঘেয়ে লেগেছে তা আমার বোধগম্য নয়।

আর দশটি গতানুগতিক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে এটি নিঃসন্দেহে আলাদা ধাচের। লেখকের বর্তমান বয়স ৯৬ হলেও লেখক তার জীবনের মাত্র প্রথম ২২ টি বছরের গল্প বলেছেন বইটিতে। আর অক্ষয় মালবেরি নামক এই আত্মজীবনী গ্রন্থের মাধ্যমেই লেখক মণীন্দ্র গুপ্তের লেখার সাথে আমার পরিচয়ের সূচনা ঘটলো।

সরকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ('প্রিভিলেজড ক্লাস') হলেন ব্যবসায়ীরা

আমাদের দেশের সরকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ('প্রিভিলেজড ক্লাস') হলেন ব্যবসায়ীরা। এ বিষয়ে আমার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ নিচে তুলে ধরছিঃ

.

(১)

বিশ্ববাজার টালমাটাল, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সরকার সর্বদাই ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। যেমন জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে কি পাম্প মালিক কিংবা এই সেক্টরে ব্যবসার সাথে জড়িত কারো কোনো লোকসান হয়েছে?

সরকার জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে, ব্যবসায়ীরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেশি মূল্যে বিক্রি করেছে। আদতে মূল চাপটা কিন্তু সামলাতে হচ্ছে ভোক্তাদের, যাদের আমরা বলি আমজনতা।

চাল, ডাল, তেল, ডিম সহ সব ধরনের জিনিসপত্রের ক্রমান্বয়ে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মাসের ব্যবধানে ১০০ টাকা লিটার তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ টাকা হয়, ব্যবসায়ীদের আদতে কোনো ক্ষতি হয় না।

যেহেতু আমাদের দেশের সরকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ('প্রিভিলেজড ক্লাস') হলেন ব্যবসায়ীরা সেহেতু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মূল্য বৃদ্ধি করে দেয় ব্যবসায়ীরা, ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ জনগণ।

.

(২)

ব্যবসায়ীরা যে আমাদের সরকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' সেটি আরো পরিষ্কার হয় আমাদের সরকারপ্রধানের বিভিন্ন সময়ের বিদেশ সফরের চিত্র দেখলে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে বর্তমান সময়ে ভারত অবস্থান করছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গিয়েছেন ১৭০ জনের বিশাল বহর নিয়ে। এই সফরসঙ্গীর তালিকায় নিরাপত্তা রক্ষী, মন্ত্রী, আমলা ব্যাতিত রয়েছেন অর্ধশতাধিক ব্যবসায়ী নেতা!

বিশাল বহর নিয়ে, বহরের মধ্যে অর্ধশতাধিক ব্যবসায়ী নিয়ে সরকারপ্রধানের বিদেশ সফর এটিই নতুন নয়। বরং সরকারপ্রধান যখনই যে দেশ ভ্রমণ করছেন তখনই অর্ধশতাধিক ব্যবসায়ী নেতা তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছেন। এমনকি জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে ও প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন ৩৬ জন ব্যবসায়ী নেতা!

উল্লেখ্য রাষ্ট্রীয় সফরের এই বিশাল বহরের ব্যয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেয়া হয়, অর্থাৎ জনগণের টাকা।

.

(৩)

কয়েকদিন আগে মোসারাত জাহান মুনিয়ার আত্মহত্যা/হত্যা মামলায় বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীরকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। মামলার অভিযোগে বলা হয়, আনভীরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মুনিয়ার। প্রতিমাসে এক লাখ টাকা ভাড়া দিয়ে ওই ফ্ল্যাটে মুনিয়াকে রেখেছিলেন আনভীর। তিনি নিয়মিত ওই বাসায় যাতায়াতও করতেন।

মুনিয়ার বোন অভিযোগ করেন, তার বোনকে বিয়ের কথা বলে ওই ফ্ল্যাটে রেখা হয়েছিল। একটি ছবি ফেসবুকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সায়েম সোবহান তার বোনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাদের মনে হচ্ছে, মুনিয়া আত্মহত্যা করেনি। তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রথম দুইদিন দেশের সমস্ত মিডিয়া এই খবর রহস্যজনক কারনে ব্ল্যাকআউট রাখে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে যখন দেশব্যাপী খবরটি ছড়িয়ে যায়, এবং মিডিয়ার ব্ল্যাকআউটের বিষয়টি সমালোচিত হতে থাকে, তখন বাধ্য হয়ে দুইদিন পর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলো সংবাদ প্রচারে বাধ্য হয়।

দেশব্যাপী আলোচিত এই মামলা নিয়ে বাংলা কোরাতে একজন মন্তব্য করেছিলেন, 'এই মামলায় যদি আনভীরের আদালত প্রাঙ্গণে পা ফেলতে হয়, তবে টাকার উপর থেকে আমার বিশ্বাস চলে যাবে।'

ঠিকই আনভীরকে আদালত প্রাঙ্গণে পা দিতে হয় নি। আনভীরকে অব্যাহতি দিয়ে পুলিশ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। আনভীর আবারো স্বদর্পে বিচরণ করতে থাকেন। এমনকি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ মুসল্লি কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বনে যান সায়েম সোবহান আনভীর!

.

উপরের আমার ব্যক্তিগত তিনটি পর্যবেক্ষণের বাইরেও অসংখ্য জিনিস রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে সহজেই অনুমান করা যায় সরকার আদতে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সর্বদাই রক্ষা করে থাকে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথমেই চিন্তা করার কথা জনগণের! কারণ জনগণের ভোট ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হতে পারে না। আমাদের সরকারের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন কিংবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই! কারণ এদেশে জনগণের ভোটাধিকার আদতে নেই, যার প্রমান ২০১৪ ও ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচন।

২০০৮ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনগণের সরকার রুপ বদলে সময়ের সাথে ব্যবসায়ীদের সরকার বনে যাওয়াটা দেশের জনগণের জন্য হতাশাজনক।

কেউ কেউ হয়তো বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টির বিগত শাসনামলের কথা মনে করিয়ে দিবেন, তুলনা করবেন। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো আমাদের একুশ শতকের প্রজন্ম কিন্তু যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে আমরা একমাত্র শেখ হাসিনার আওয়ামিলীগ শাসনামল দেখে বড় হয়েছি। আর তুলনার সময়ে ছোটবেলায় ভাবসম্প্রসারণ শিখার সময়ে পড়া চরণদ্বয়ের কথা মনে পড়ে, "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"

দুপুর ২ টা

৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

ইউআইইউ লাইব্রেরি

শাসন ব্যবস্থা সরকারের ফ্ল্যাক্সিবল বল

শাসন ব্যবস্থা সরকারের হাতের মুঠোয় থাকা একটি নরম রাবারের ফ্ল্যাক্সিবল বল।

যে কারো বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে হাতের মুঠোতে থাকা সেই বলে নিয়ে আসা হয়।

সরকারের যখন ইচ্ছে হয় তখন সেই আসামীকে আকাশে উড়তে দেয়, আবার যখন ইচ্ছে হয় ঐ বলে পুশ করে সেই আসামীকে বন্ধী করে।

১০ বছরের পুরাতন মামলায় একজন আসামী ১০ বছর পরে গ্রেফতার হয়, ঐ একই মামলায় অন্য ৫ জন আসামী সদর্পে আকাশে উড়াউড়ি করে, যতদিন না সরকারের বিরাগভাজন হয়।

কারো নামে পুরাতন মামলা না থাকলেও তেমন সমস্যা নেই, থানাগুলোতে থাকা শত শত অজ্ঞাতনামা মামলার যেকোনোটাতে যাকে যখন খুশি সেটাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেটা না হলেও নতুন মনগড়া মামলা (বিশেষ করে ইয়াবা পকেটে ঢুকিয়ে) দিয়ে বন্ধী করা হয়। আর সবচেয়ে মারাত্মক যে জিনিসটা হয় সেটা সাদা পোষাকধারী সংঘবদ্ধ কোনো দলের হাতে বিচারবহির্ভূত গুম কিংবা অস্ত্র উদ্ধারের নাটকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গুলি করে হত্যা।

এই নরম রাবারের ফ্ল্যাক্সিবল বলটি যতদিন সরকার ইচ্ছেমতো চাপ দিয়ে হাতের মুঠোতে টাইট করবে আবার ইচ্ছেমতো চাপ কমিয়ে ফুলতে দিবে ততদিন ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকবে।

তাই এদেশের আইনকে পুরুষের যৌনাঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়, যেটা জায়গামতো শীতল থাকে আবার জায়গামতো হয় উত্তেজিত।

অথচ একটি আদর্শ রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা সরকারের হাতের মুঠোয় থাকা নরম রাবারের ফ্ল্যাক্সিবল বল না হয়ে একটি সলিড বল হয়। যেটা সব জায়গায় সমান্তরালে চলে। বোধহয় বাংলাদেশের ইতিহাসের ৫০ বছরে এমনটি কখনোই ছিলো না। কিন্তু আবারো বলতে হয় এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো আমাদের একুশ শতকের প্রজন্ম কিন্তু যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে আমরা একমাত্র শেখ হাসিনার আওয়ামিলীগ শাসনামল দেখে বড় হয়েছি। আর অন্য সময়ের সাথে তুলনার সময়ে ছোটবেলায় ভাবসম্প্রসারণ শিখার সময়ে পড়া চরণদ্বয়ের কথা মনে পড়ে, "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"

দুপুর ২ টা

ইউআইইউ লাইব্রেরি

বাড্ডা, ঢাকা

১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস

বর্তমানে পৃথিবীতে ৪,০০০ এর অধিক ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

এমন একটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করুন যে পৃথিবীর নিয়ম হলো মানবশিশু জন্মগ্রহণ করার পর তার অপরিণত মস্তিষ্কে কোনো ধর্মবিশ্বাসের বীজ পুতে দেয়া হয় না।

সে জীবনের প্রথম ১৮ বছর কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না, ১৮ বছর বয়স এর আগে পর্যন্ত ধর্ম বিষয়টি সম্পর্কেই সেই পৃথিবীতে তার কোনো ধারণা থাকে না।

অতঃপর সে যখন ১৮ বছর বয়সে পা রাখে (প্রাপ্তবয়স্ক হয়,চিন্তা করে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে) তখন তাকে একটি ধর্ম পছন্দ করে নিতে হবে, একটি ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। এটাই নিয়ম।

.

এখন পৃথিবীতে ৪,০০০+ ধর্ম আছে।

একটি ধর্ম সম্পর্কে জানতে যদি ১ সপ্তাহ/৭ দিন সময় লাগে, তবে সবগুলো ধর্ম সম্পর্কে তার জানতে সময় লাগবে ৭৬+ বছর!

১৮ বছর + ৭৬ বছর = ৯৪ বছর, যেখানে মানুষের গড় আয়ু মাত্র ৭২ বছর।

অর্থাৎ খুব কম মানুষই তার জীবদ্দশায় সবগুলো ধর্ম যাচাই করার সুযোগ পাবে।

.

৪০০০+ ধর্মের অনুসারীরা প্রত্যেকেই তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সত্য মনে করে থাকে। তারা এটি ও মনে করে যে শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাস করা ঐ একটি ধর্ম ব্যতীত বাকি সব ধর্ম মিথ্যে।

.

তাহলে পৃথিবীর ৪০০০+ ধর্ম সব যাচাই না করে শুধু একটি ধর্মকেই (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিণত মস্তিকে যে ধর্মের বীজ পুতে দেয়া হয়) সত্য বলে বিশ্বাস করা পৃথিবীর সব ধর্মবিশ্বাসীকে কি অন্ধবিশ্বাসী বলা যায়?

মৃত্যু

“এই ক’টা দিন আমি বাঁচার জন্য বাঁচতে চাই না।”

মৃত্যু নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা এই গানের লাইনের মতোই। যখন জীবনকে টেনে নেয়ার কোনো ধৈর্য থাকবে না, যখন পৃথিবীর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ থাকবে না, যখন আমি বুঝতে পারবো পৃথিবী কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেবার মতো আমার অবশিষ্ঠ কিছুই নেই, আমি শুধু পৃথিবীর অন্ন-বাতাস ধ্বংস করছি, তখন আমি স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করবো, স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করবো না।

কিছুদিন আগে সরকারদলীয় একজন বড় নেতার মৃত্যু হয়েছে, যার বাবাও ছিলেন স্বাধীনতার সময়ের একজন বড় নেতা। লোকমুখে শুনা, সেই নেতার নাকি করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। যেখানে স্বাস্থ্যখাতে চরম বেহাল দশা নিয়ে মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত খবর প্রকাশ করা হচ্ছে, আইসিউ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবে রাস্তাঘাটে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সেখানে প্রথম থেকেই সরকারের পক্ষ থেকে নিজেদের করোনা মোকাবেলায় সফল দাবি করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি সরকারের একজন মন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, যিনি দীর্ঘদিন এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন, সেটি সরকারের ব্যর্থতা নগ্নভাবে প্রকাশ করবে। তাই সেই নেতার মৃত্যুর পরেও নাকি খবর প্রকাশ করা হয়নি। উনি করোনা মুক্ত হওয়ার পর সেই খবর প্রকাশ করা হয়েছে, “হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হলেও তিনি স্ট্রোক করে মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালীন সময়ে নমুনা পরীক্ষা করে তার দেহে করোনাভাইরাস পাওয়া যায় নি।”

একজন সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের দেহ ও নাকি লাইফ সাপোর্টে রেখে তার স্ত্রী ও তার ভাইয়ের সাথে দর কষাকষি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। সবগুলোই গুজব হতে পারে, কোনোটি বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করি নি আমি। কারন রাজপ্রাসাদের গুজব সত্য কি মিথ্যা সেটি প্রজারা যাচাই করতে পারে না, তাদের সেই সক্ষমতা নেই।

আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি না হবার কারনে, আমার তেমন কোনো সমস্যা নাই। আবার অনেকে নিজ শক্তিতে হাটা, চলা, খাওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে অন্যের কাধে নির্ভর করে স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকেন। আমি এমনটাও করবো না। যে ক’টা দিন বাঁচবো উড়াধুরা বাঁচবো, হঠাৎ একদিন টুপ করে ঝরে পড়ে যাবো।

আমি ইতিমধ্যে সন্ধানী চক্ষুদান সমিতির নিকট মরোণত্তর চক্ষুদানের বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আর আমার মৃত্যু যদি আমার বাবা-মায়ের দুইজনেরই পরে হয়, তবে বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরপরই আমার দেহ কোনো মেডিকেল কলেজে দান করার বিষয়ে যাবতীয় ডকুমেন্টস রেডি করে রাখবো। আর যদি আমার মৃত্যুর সময়ে আমার মা কিংবা বাবা কোনো একজন জীবিত থাকেন, তবে আমার মৃত দেহ উনাদের জন্য উৎসর্গিত থাকবে। উনারা উনাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য নিজেদের মতো করে আমার দেহের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। সম্ভবত সেটি হবে, আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে ধর্মীয় নীতি মোতাবেক দাফন (এটিই হবার সম্ভাবনা বেশি, যদিও পুরোটা উনাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে)।

বকবকঃ জাহানারা পারভীনের বই – ‘প্রফেট ও জিবরান’

ভূমিকা

১.

শ্রদ্ধেয় জাহানারা পারভীনের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আমাদের মুক্তাঞ্চল সাহিত্য উৎসব – ২০২১ এর মাধ্যমে। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা শ্রদ্ধেয় জাহানারা পারভীনকে উৎসবকালীন সময়ের প্রথম দিন মনে হয়েছিলো তিনি একজন নিভৃতচারী মানুষ। দ্বিতীয়দিন শ্রীমঙ্গল ঘুরতে যাওয়ার সময় গাড়িতে উনাকে আবিষ্কার করি প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি হিসেবে।

প্রফেট ও জিবরান বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, একা থাকার স্বভাব, আড়াল খোঁজার প্রবণতাও জিবরানের সঙ্গে আমার সংযোগের সূত্র। অর্থাৎ তিনি নিজেকে অন্তর্মুখী মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তিনি প্রথম সারির টেলিভিশন চ্যানেলে সাংবাদিকতার মতো ‘বহির্মুখী’ পেশায় সফলতার সহিত দায়িত্ব পালন করছেন।

২.

প্রেম তাঁর কাছে আত্মিক অনুপ্রেরণা। প্রেমিকাদের সঙ্গে স্থাপন করেছেন ব্যতিক্রম সম্পর্কের দৃষ্টান্ত। মেরিকে উইল করে গেছেন সব ছবি ও হৃদপিণ্ড। বলেছেন, মৃত্যুর পর তার হৃদপিণ্ড যেন দেহ থেকে তুলে মেরির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রফেট ও জিবরান বইয়ের ভূমিকায় জিবরান সম্পর্কে এই তথ্যটি আমাকে বইটি পড়ার ও জিবরানকে নিয়ে জানার প্রকৃত কৌতুহল সৃষ্টি করে দেয়। প্রফেট বই ও লেখক জিবরান সম্পর্কে আরো অসংখ্য তথ্য ভূমিকায় দেয়া থাকলেও এই বাক্যটি কেন আমাকে টেনেছে সেটির ব্যাখ্যা আমার নিকট নেই।

.

আত্মার অসুখ সারানোর দাওয়াই

কিছুটা অপেক্ষার পর

বাতাসের ওপর বিশ্রামের পর

আমাকে ধারণ করবে অন্য এক নারী

প্রফেটের চরিত্র আল মোস্তাফা প্রস্থানের আগে বিষণ্ন সমগ্র অর্ফালিসের জন্য রেখে এসেছিলেন এমন ফিরে আসার আশ্বাস। পড়তে পড়তে আমার মনে হয় বার বার নিজের ভস্ম থেকে জন্ম নেয়া প্রাচীন গ্রিক পুরাণের পবিত্র পাখি ফিনিক্সের কথা।

মোস্তফা চরিত্রটির ফিনিক্স পাখির মতো অর্ফালিস দ্বীপে পূনর্জন্ম হয়েছিলো কি না জানা নেই, তবে মোস্তফা চরিত্রটি সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের স্রষ্টা জিবরানের পুনর্জন্ম হয়েছিলো।

জাহানারা পারভীন লিখেছেন,

পুরো প্রফেট লেখাটি একটি কথাই বলছে, নিজেকে যতটা জান, তার চেয়েও অনেক বড়, মহৎ তুমি। প্রফেট লেখার পর এভাবেই নিজেকে আবিষ্কার করেছেন জিবরান। সারিয়ে তুলতে চেয়েছেন আত্মার অসুখ। এ যেন এক পুনর্জন্ম।

'এটি আমার প্রথম বই, প্রকৃত গ্রন্থ, পরিণত লেখা। এই লেখার জন্য যেন হাজার বছর অপেক্ষা করেছি।' একটি বই লেখার পর কোনো লেখক যদি ঐ বইয়ের ভূমিকায় এভাবেই তাঁর লেখা আগের সব বই নাকচ করে দেন, তবে তিনি তাঁর এই বইটি নিয়ে কতটুকু আত্মবিশ্বাসী এবং আশাবাদী সেটা বলাই বাহুল্য। জিবরানের এই আশাবাদ অমূলক ছিল না, প্রফেট বইটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। জিবরানের জীবদ্দশাতেই বইটি অনূদিত হয়েছে বিশটি ভাষায়।

প্রথম পর্ব পড়ার পর আল মোস্তফা চরিত্রটি আমার মনে হয়েছে জিবরানের কল্পনাপ্রসূত নিজের চরিত্র, যে চরিত্রটি ধর্মীয় নেতা আব্দুল বাহা দ্বারা প্রভাবিত।

.

এপ্রিলের আলোয় লেখা

এই পর্বে মেরি ও জিবরানের সম্পর্ক দেখে অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছে। জিবরান প্রফেট লিখতে গিয়ে প্রতিবার মেরিকে জানিয়েছেন, আলোচনা করেছেন, মতামত জানতে চেয়েছেন। মেরির দেওয়া পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করেছেন, লেখায় সংযোজন বিয়োজন করেছেন, একসাথে প্রফেটের সম্পাদনা করেছেন। মেরিও নিয়মিত জার্নালে প্রফেট নিয়ে লিখেছেন। এই বোঝাপড়া, এই সম্পর্ক, এই বন্ধুত্ব প্রতিটি শিল্পীর বহুল আকাঙ্ক্ষিত।

এপ্রিল মাসে মেসাচুসেটসে মিসেস মেরি ট্যুডর ফার্ম হাউসের কটেজে বসে শেষ হয় প্রফেট বইটির প্রথম খসড়া। একসাথে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার পর ছাপাখানা থেকে আসা কালো প্রচ্ছদের বইয়ের প্রথম কপি জিবরান পাঠান মেরিকে। মেরি উচ্ছ্বাসিত হয়ে জানান, সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলবে প্রফেট। বলা বাহুল্য মেরির বানী সত্য হওয়ার জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি।

.

এ স্ট্রেঞ্জ লিটল বুক

জীবদ্দশায় জিবরানের মতো খুব কম লেখকই নিজের বইয়ের পাঠকপ্রিয়তা দেখে যেতে পারেন। জীবদ্দশায় জিবরানের প্রফেট যেভাবে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিলো, এবং জাহানারা পারভীন তাঁর প্রফেট ও জিবরান বইয়ে যেরকম সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন, পড়ার পর সেটি যে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এতো পাঠকপ্রিয়তার পরেও আমেরিকান সমালোচক, বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া সমাজ প্রফেটকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেননি। জন্মভূমি লেবাননের সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তি, ধর্মযাজক, মিডিয়া, সেন্সর বোর্ড তথা শাসকগোষ্ঠী জিবরানের লেখা বর্জন করেছে। এর কোনোটাতেই অবাক হই নি। বরং বর্তমান সময়কে নিয়ে এটি আমাকে আশাবাদী করেছে।

প্রফেটের পাঠকপ্রিয়তার পরেও ঐসময়ের একটি শ্রেণি জিবরানের বিরোধিতা করেছে। বর্তমান সময়েও যেকোনো ভালো কাজের পেছনে এমন অসংখ্য বিরোধী পক্ষ থাকে। মূলত যাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারাই সে বিরোধী পক্ষ।

শিল্প-সংস্কৃতিতে এই বিরোধী পক্ষ অধিকাংশ সময়েই ধর্মীয় গুরু এবং শাসকগোষ্ঠী। যেটা অতীত কিংবা বর্তমান উভয় সময়ের জন্যই সত্য। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বর্তমানে স্বার্থের আঘাত লাগার পরেও ধর্মীয় গুরু কিংবা শাসকগোষ্ঠী জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হন। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এই শিল্প-সংস্কৃতির বিরোধীপক্ষ অধিকাংশ সময় মুখ লুকোতে এবং শাসকগোষ্ঠী জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসান। জিবরানের সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থাকলে হয়তো এমনটাই হতো। তাই এটি আমাকে আশাবাদী করেছে।

জিবরান যে সব সমালোচনাকে উপেক্ষা করে প্রফেটের ট্রিলজি লেখার জন্য মনস্থির করেছেন, এই বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করেছে। এই মেরুদণ্ডটাই হয়তো একজন লেখককে মহৎ করে তোলে।

.

মৃত্যুর প্রেমে পড়া হৃদয়

লোকে যাকে মৃত্যু বলে আমি তার কথা ভেবে আনন্দিত হই। প্রস্থানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি। তবে এরপরই নিজেকে মনে করিয়ে দেই যে যাওয়ার আগে আমাকে একটা কথা বলে যেতে হবে। যে কথা এখনো বলিনি। এই কথাটি উচ্চারণের আগে মৃত্যু হলেও আবার ফিরে আসব সেই কথাটি বলতে।

সৃষ্টিশীল মানুষরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজেকে শূন্য মনে করে হতাশায় ভুগেন, সেই হতাশায় প্রফেট লেখার পরে জিবরান ও ভুগেছেন, মৃত্যুর অপেক্ষা করেছেন। এই অধ্যায়ে জিবরানের প্রফেট পরবর্তী সময় ও ঐ সময়ের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন জাহানারা পারভীন। প্রফেটের ট্রিলজির কথা পড়ে পূর্বের অধ্যায়ে যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম মৃত্যুর প্রেমে পড়া হৃদয় অধ্যায়টি তেমনি মনের মধ্যে খারাপ লাগা সৃষ্টি করেছে।

.

পশ্চিমের পথে পূর্বের বাঁশিওয়ালা

একবার পড়ার পর অন্য অধ্যায়গুলোর মতো এই অধ্যায়ের সারমর্ম বুঝতে সক্ষম হলাম না। সম্ভবত নিজের বিক্ষিপ্ত মনের জন্য অথবা নিজের জ্ঞানের দৈন্যতার জন্য। সিদ্ধান্ত নিলাম আবার পড়ার।

পরের দিন পুনরায় পড়লাম অধ্যায়টি। লেখক জাহানারা পারভীন এই অধ্যায়ে জিবরানের প্রাচ্য (লেবানন) থেকে পাশ্চাত্যে (আমেরিকায়) আসার ঘটনাপ্রবাহ ও আমেরিকা আসার পর প্রথমদিকের সময় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও সংবেদনশীল জিবরান সম্পর্কে বলেছেন, যে জিবরানের লেখাকে অস্থির করে তোলে বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল।

পাশ্চাত্যে বসবাস করলেও জিবরানের মন সর্বদা পড়ে রয়েছে প্রাচ্যে। বারবার ফিরতে চেয়েছেন নিজের জন্মভূমি লেবাননে, জন্মস্থান বিসররি গ্রামে। ছিলেন প্রাচ্যের জনগনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। স্বদেশিদের অটোমান শাসকদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কথা বলেন, স্বাধীনতার পক্ষে ধরেন নিজের কলম, গঠন করেন যোদ্ধাদের সহায়তার জন্য তহবিল।

এই অধ্যায়ে জানলাম আল মোস্তফা একই সাথে যিশুর প্রতিচ্ছবি এবং হজরত মোহাম্মদের ছায়া, যা বহু ধর্মের সহাবস্থানকে নির্দেশ করে।

.

সন্ন্যাসীর আশ্রম

এতক্ষণ যাবত পুরো বইজুড়ে লেখক জিবরানকে নিয়ে মূল আলোচনা হলেও এই অধ্যায়ে জাহানারা পারভীন বলেছেন ‘চিত্রশিল্পী জিবরান’ সম্পর্কে। জন্মগত শিল্পী বলতে যা বুঝায়, জিবরান তা-ই। কবিতা লেখার আগে থেকেই ছবি লেখার প্রতি আগ্রহ তাঁর। শৈশব থেকে শুরু করে জিবরানের পুরো সময়ের চিত্রকর্ম নিয়ে লেখা এই পর্ব পড়ে একজন নিকটতম চিত্রশিল্পী ছোটভাইয়ের কথা মনে হলো, যাকে খুব শীঘ্রই এই বইটি উপহার পাঠাবো। আমার বিশ্বাস এই অধ্যায়টি আমার মতো তাঁর ভালো লাগবে।

.

জাগতিক বিস্ময়, অজাগতিক আলো

একজনের সুপারিশকৃত চিঠি জিবরানের জীবনে ভূমিকা রেখেছে, এই সাধারণ বাক্যটি জাহানারা পারভীন লিখেছেন, মাটিলেপা কাঁচাঘরের মেঝেতে পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে যাওয়ার মতো সেই চিঠির শব্দ ছাপ রেখে গেছে বালকের জীবনে। চমৎকার!

পরিবেশ যেকোনো সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় পড়ে জানতে পারি আমেরিকায় অভিবাসী শিশুদের মূল স্রোতে ফেরাতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। এজন্য তৈরি হয়েছিলো অসংখ্য সেটেলমেন্ট হাউজ। সমাজসেবী, পাঠাগার কর্তৃপক্ষরা অভিবাসী শিশুদের নিকট বই পাঠাতো, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই পড়ে শুনাতো। বইগুলোকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আপন করে তুলতো। এরকম সুন্দর পরিবেশ যদি আমেরিকায় সৃষ্টি না হতো তবে জেসি ফ্রিমট বেইল হয়তো জিবরানের মতো একজন অভিবাসী শিশুর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করতেন না, ফ্রিডল্যান্ড হল্যান্ড ডে কে চিঠিও লিখতেন না। আর ডে এর সাথে দেখা না হলে জিবরান কি আজকের জিবরান হতে পারতেন?

.

জীবনের জীয়নকাঠি

ডে এর পরে জিবরানের পৃষ্টপোষকতা করেন মেরি। মেরি জিবরানের বন্ধু, যাকে ভালোবেসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন জিবরান। মেরির মতে, বয়সের কারণে বিয়েটা প্রশ্নের উর্ধ্বে। একটা দূর্বল বিয়ের জন্য ভালো বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চান না মেরি। তাই জিবরানের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেও আমৃত্যু জিবরানকে সমর্থন দিয়েছেন, আস্থার মানুষ হিসেবে থেকেছেন। অপরিচিত একজন মানুষকে এভাবে সমর্থন যোগানো, শিল্পশিক্ষার জন্য নিজ খরচে প্যারিস প্রেরণ সবকিছু মেরির সুন্দর মন ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের উদাহরণ।

.

সে তোমাকে ছুড়ে দেবে পবিত্র আগুনে

পড়ছি আর চমৎকৃত হচ্ছি। এই অধ্যায়ে পাঠককে এমন চমকে দেয়ার জন্যই কি জাহানারা পারভীন পূর্ববর্তী সব অধ্যায়ে মেরি যে জিবরানকে বিয়ে করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলো তা উল্লেখ করেন নি? মেরি নাকি সারাজীবন

চেয়েছেন জিবরানের প্রেমিকার স্বীকৃতি যা নিয়ে জিবরান ভুগেছেন সংকোচ ও দ্বিধায়। জিবরান চেয়েছিলেন মেরিকে বিয়ে করতে, আর এখানেই ছিলো মতপার্থক্য।

জিবরান ও মেরির সম্পর্ক যে অসংখ্য চড়াই উৎড়াই এর মধ্য দিয়ে জিবরানের মৃত্যু অবদি গিয়েছে, লেখক তার বর্ণনা করেছেন এই অধ্যায়ে।

দৃশ্যান্তরের দুনিয়া

এই অধ্যায়ে জিবরান ও তার পরিবারের দেশান্তর ও নতুন দেশে এসে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। কামিলে একজন আদর্শ মায়ের মতো তাঁর সন্তান জিবরানকে আঁকড়ে রেখেছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সম্ভাবনার আলো দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অভিবাসী পরিবার, দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত; কামিলে তাঁর অন্য সন্তানকে কাজে দিলেও জিবরানকে কাজ করতে দেননি, তাঁকে স্কুলে প্রেরণ করেছেন। ছোটবেলাতেই জিবরানের যে সৃষ্টিশীলতা আবিষ্কার করেছিলেন জিবরানের আঁকা দেখে, বিচক্ষণ কামিলে সেটি প্রস্ফুটিত হতে দিয়েছেন যথার্থভাবে।

শেকড়ের কাছে ফেরা

বইয়ের সর্বশেষ ও সবচেয়ে বিষন্ন অধ্যায় এটি। পড়তে গিয়ে মনে খারাপ লাগা অনুভূত হয়। অসুস্থ কবি, মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী সময় নিয়ে এই অধ্যায়। যে জিবরান লেবানন থেকে অভিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকা, সে জিবরান দেশে ফেরেন চিরদিনের মতো নিথর হয়ে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার দিয়ে জিবরানের লাশ গ্রহণ করে জিবরানের মৃত্যুর চার বছর আগে স্বাধীন হওয়া লেবানন। পথের দুপাশে জনতার ভীর হয় কবিকে এক নজর দেখতে। যে জিবরান চিরদিন ফিরতে চেয়েছেন নিজের জন্মস্থানে, শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর চির আবাস হয়েছে সেই জন্মস্থানে।

সমাপ্তি কথা

পুরো বই জুড়ে জিবরানের লেখাগুলোর যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে, সেটি সহজবোধ্য ও যথেষ্ট সাবলীল। এই লেখাগুলো যে কারো আত্মাকে নাড়া দিবে, ভাবতে বাধ্য করবে। পুরো বই পড়ার পর আমার মতো যাদের কখনো জিবরানের সাথে পরিচয় ছিলো না তাদেরও জিবরানের আঁকা ছবি দেখার ও কবির লেখা পড়ার অদম্য স্পৃহা জন্মাবে। সেই ক্ষুধা কিছুটা মেটানোর জন্যই হয়তো জিবরানের ছবি, জিবরানের আঁকা ছবি সহ মোট ২০ টি ছবি বইয়ের শেষে যুক্ত করেছেন লেখক।

বইটির নাম ‘প্রফেট ও জিবরান’ হলেও প্রফেটের চেয়ে জিবরানের প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। জিবরানের ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যকর্ম, চিত্রকর্ম সহ জিবরানের পুরো জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন জাহানারা পারভীন। বইটি পড়তে পড়তে আরেকটি বইয়ের কথা খুব মনে হচ্ছিলো। জাহানারা পারভীন যেমন জিবরানকে নিয়ে লিখেছেন ‘প্রফেট ও জিবরান’ তেমনি বাঙালি কবি জীবনানন্দকে নিয়ে শাহাদুজ্জামান লিখেছেন অসাধারন একটি বই – ‘একজন কমলালেবু’। দুইটির বইয়ের মধ্যে কোথায় যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়!

এতোদিনেও প্রফেট পড়ি নি বলে অনুশোচনা হচ্ছে। বিদায়, বিদায়, বিদায়, প্রফেট পড়তে যাই।

~ ২০ নভেম্বর ২০২২

ভাটারা, ঢাকা।

২০২১

করোনা ভাইরাসকে লেখা চিঠি

অপ্রিয় করোনা ভাইরাস,

এমনটাতো হওয়ার কথা ছিলো না! খুব বেশি ক্ষতি কি হয়ে যেত, যদি পৃথিবীতে আপনি হানা না দিতেন? যখন আপনার শখ জাগলো পৃথিবীতে হানা দিবেন, তাহলে শুধু চিনদেশে সীমাবদ্ধ না থেকে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেলেন কেন? হোমো রুডলফেনসিস, হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো নিয়ান্ডার্থালেনসিস এর সহোদর আমরা হোমো সেপিয়েন্স যারা নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে আত্মতৃপ্তিতে ভুগি তাদেরকে ঘরবন্দী করাটা কি এতোই প্রয়োজনীয় ছিলো আপনার জন্য?

২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে আপনি আক্রমণ করেছেন এমন একজন রোগী শনাক্ত করা হয়। আপনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বেন, তাই আপনাকে রুখতে ১৭ মার্চ বন্ধ করে দেয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু আমরা যে ছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার্থী, ১৫ দিন পর আমাদের জীবনের তথাকথিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষায় বসার কথা! আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতি ও নিয়ে রেখেছিলাম খুব ভালোভাবেই।

তারপর কবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে, কবে আমরা পরীক্ষায় বসতে পারবো সে আশায় দিন যায় মাস যায়! সময় টিভি আর কালের কণ্ঠ মজা নিতে থাকে আমাদের নিয়ে। সে এক অস্থির সময়, কখন যে পরীক্ষা হয়ে যায়!

উৎকণ্ঠায় ৮ মাস থাকার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করলেন এইচএসসি পরীক্ষা এইবছর হবে না, সবাই অটো প্রমোশন!

এক ধাপতো পেরোনো গেল, এবার আরেক ধাপ এডমিশন। ইউনিভার্সিটিগুলো বার বার পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করতে লাগলো, আমরাও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে থাকতে লাগলাম দিনের পর দিন!

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হলো, কিন্তু আপনিতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন পুরো দেশজুড়ে। কর্ম হারালো হাজারো মানুষ, শ্রমিকদের নিয়ে মজা নিলো কারখানার মালিকরা, আর গুজব- সে তো আমার দেশের অতি সাধারণ চিত্র!

কি এমন হতো আপনি পৃথিবীতে হানা না দিলে?

দ্রুত চলে যান, অনুগ্রহপূর্বক।

ইতি,

হোমো সেপিয়েন্স

আত্মহত্যা

আত্মহত্যার পক্ষে-বিপক্ষে আমার অবচেতন মন প্রতিনিয়ত যুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। কখনো যদি পক্ষের পাল্লা ভারী হয়, পরমুহূর্তেই বিপক্ষের পাল্লা দ্বিগুন ভারী হয়ে যায়। এভাবেই চলতে থাকে।

.

আত্মহত্যার পক্ষেও আবার যুক্তি দেয়া যায় নাকি?

অবশ্যই যায়, পৃথিবীতে যারা এ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে তাদের অবচেতন মন আত্মহত্যার পক্ষে ভারী যুক্তি দিয়েছিল বলেই আজকে তারা পৃথিবীতে আর নেই।

.

আত্মহত্যার পক্ষে আপনার যুক্তি কি?

কেউতো আর শুধুমাত্র একটি কারনে আত্মহত্যা করে নাহ। জীবনের অনেক সমস্যা হতাশা হয়ে যখন একত্রে বুকে ভর করে, সে বোঝা বইতে না পেরেই মানুষ আত্মহত্যা করে। আমি এখনো বেচে আছি কারন সে বোঝা বইতে পারার সক্ষমতা এখনো আমার আছে!

.

মৃত্যুর পরে নাকি মানুষ ভালো হয়ে যায়, সবার প্রিয় হয়ে যায়।

ক্লাসের শেষ সারির কোনো ছাত্র যদি মারা তখন সবাই বলে "মেধাবী ছাত্রের অকাল মৃত্যু।"

মানে মৃত্যুর পর সবার সাত খুন মাফ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মৃত্যুর পরে খারাপ ছাত্রটাও যে মেধাবী হয়ে যায়, খারাপ মানুষরাও খুব ভালো মানুষ হয়ে যায়, সেটা আর তারা বুজতে পারে না, জানতে পারে না যে পৃথিবীতে তারা এতো খারাপ ছিল সেই পৃথিবী তাদেরকে কতটা ভালো বানিয়ে সবার প্রিয় করে নিয়েছে।

.

আর এই পৃথিবী থেকে সবাইকে একদিন তো ছুটি নিতেই হবে!

কেউ আগে বা কেউ পরে।

সবাইকে বাধ্যতামূলক ছুটি নিতে হবে, আমার ছুটি টা না হয় একটু দ্রুত স্বেচ্ছায় হোক।

ক্ষতি কিসের?

.

আসলে আমি খুব ভীতু প্রকৃতির একজন মানুষ। আমি যদি সাহসী হতাম তবে কবেই আত্মহত্যা করে ফেলতাম। আমিও সে সমস্ত মানুষদের দলভুক্ত বারবার হাজারবার মৃত্যুচিন্তা করে যারা।

কিসের ভয়? আত্মহত্যা মহাপাপ, পরকালে অসীম আজাবে ভুগতে হবে সেই ভয়?

নাহ, একদমই না।

তাহলে?

আমার আশেপাশে থাকা পৃথিবীর এতো সুন্দর মানুষদের মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরেই হারিয়ে ফেলব, আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে এই পৃথিবী থেকে, সেই ভয়।

যে ভয়ের কারনে অসংখ্য কারন আশেপাশে রেখেও মরতে মরতে বেচে যাই বারবার।

.

এই অসময়ে বাথরুমে বসে কি সব আবোলতাবোল লিখছি!

সুখে থাকলে তো ভুতে কিলায়।

ধ্যাত চুল,

বাইরে যাই, আমার অনেক কাজ বাকি।

বিজ্ঞান বনাম অন্ধত্ব

অনাবৃষ্টির কারনে যখন ফসলের ক্ষতি হতো, টিউবওয়েল কিংবা পুকুরের পানি শুকিয়ে যেত, চৈত্র-বৈশেখের প্রচণ্ড খরায় যখন মাঠ ফেটে চৌচির তখন 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি ছায়া দেরে তুই' বলে নেচে গেয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা অথবা বৃষ্টির আশায় 'ব্যাঙের বিয়ে' এর মতো হাস্যকর কর্মকাণ্ড করতো আমাদের প্রাচীন বাংলার সহজ সরল মানুষজন।

মাঠে গিয়ে বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা এমনকি ভারতীয়রা এখনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রসাদ ও পশু উৎসর্গের মাধ্যমে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করতে চেষ্টা চালিয়ে যায়!

বৃষ্টির জন্য এ উপমহাদেশের মানুষজন কতটা অসহায়!

.

বৃষ্টির জন্য শুধুই কি এই উপমহাদেশের মানুষজন অসহায়? পশ্চিমের লোকজন অসহায় নয়?

.

উত্তরটা হলো অবশ্যই না। উন্নত দেশগুলো যখন খুশি তখনই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত তৈরি করতে পারে! নতুন মনে হচ্ছে?

.

বিষয়টি একদম নতুন নয়। এ প্রযুক্তি আবিষ্কার হয় ১৯৪৬ সালে!

১৯৬৭ সালেই ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নজিরবিহীনভাবে ক্লাউড সিডিং প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটায়। মূলত এর ফলে বন্যা ও ভূমিধ্বসে ভিয়েতনাম বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে খাদ্য ও অস্ত্র পরিবহন কঠিন হয়ে ওঠে।

.

যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড সহ বিশ্বের অনেক দেশ নিজেদের ইচ্ছে মতো কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে।

এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত দিয়ে অগ্রীম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সম্ভাব্য দূর্যোগ মোকাবিলা করা হয়।

.

কিভাবে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত তৈরি করা হয়?

ড্রাই আইস ও অন্যান্য রাসায়নিক বিমানে বা রকেটে করে মেঘের উপর একটি নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ড্রাই আইসের গুড়া ছড়িয়ে দিলেই সেটা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এলাকার মাটিতে পড়ে।

Cloud Seeding প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলো যখন চাইলেই বৃষ্টিপাত ঘটায় আবার অতিবৃষ্টিতে বিরক্ত হলে সেটাও রোধ করে তখন আমরা অনেকেই বৃষ্টির উপর মনুষ্যকূলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এই ধারণা নিয়ে বসে আছি।

বুক রিভিউঃ পলাশী থেকে মুজিবনগর - নিখিল ভট্টাচার্য

ছোটবেলায় সমাজ অথবা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে যে বিষয়গুলো পড়তে অধিকাংশ মানুষের খুবই বিরক্ত লাগত, ইতিহাসের সেই কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় লেখক 'নিখিল ভট্টাচার্য' তার 'পলাশী থেকে মুজিবনগর' বইতে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

.

আমরা ছোটবেলায় পড়ে এসেছি '১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।' বাক্যগুলো বলে তার আগে পিছে দাড়ি টেনে আমরা সর্বদাই সমাপ্ত করে দেই। কিন্তু লেখক বিষয়গুলোকে বর্ণনা করেছেন আরো বিস্তৃতভাবে -

"সূর্য তো মধ্যাহ্নাকাশে অস্ত যায় না। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল সূর্য ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে সায়াহ্নে অস্ত যায়। সতেরশ সাতান্নের একটা অতীত আছে। পলাশীকে জানতে গেলে যেতে হবে সেই সুদূর অতীতে, যেদিন রাহুর দশা লেগেছিলো ভারত ভূ-খণ্ডে।"

ঠিক তেমনই ভাবে লেখক বলেছেন - "১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার রমনা উদ্যানে একান্নবই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের প্রতীকী আত্মসমর্পণে বুক টান করে দাঁড়াল যে বাংলাদেশ, এখানেই তার সংগ্রামের সমাপ্তি নয়। তারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। পলাশীর যেমন অতীত ছিল মুজিবনগরেরও থেকে গেল এক ভবিষ্যৎ। বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ।"

অর্থাৎ লেখক বিষয়গুলোর আগে পিছে দাড়ি না টেনে অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখাতে চেয়েছেন।

.

পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করে বাংলায় সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম ও শুরু হয় এই বাংলার মাটি থেকেই তাও সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাত্র ৩ বছরের মাথায়, কংগ্রেসের দাবী অখণ্ড ভারতের, কিন্তু মুসলিম লীগের দাবি পাকিস্তান ও ভারত দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন সব তথ্য থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা এমন সব তথ্য লেখক অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন পুরো বই জুড়ে।

.

বইটির নাম পলাশী থেকে মুজিবনগর হলেও ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ এই ৪০০ বছরের ইতিহাসের অলিগলিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। বইটি পড়া শেষ হলে ৪০০ বছরের ইতিহাসের মোটামুটি ধারনা পেয়ে যাবেন। যেখানে কিভাবে ভারত ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়, দেশভাগের কালো অধ্যায়, দাঙ্গায় শত সহস্র মানুষের হত্যাকাণ্ড, দেশভাগে গান্ধী-নেহেরু-জিন্নাহ কার কি ভূমিকা ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকান্ড ও বিচার প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পারবেন।

.

এছাড়াও ১৯৭৪ সালেই খন্দকার মোশতাক ভূট্টোর সাথে সোনার বাংলাকে আবার পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর খুনি ফারুক,ডালিম,রশিদদের সাথে ভূট্টোর সৌজন্য আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এমন সব নতুন কিছু তথ্য বইতে পেয়েছি। তথ্যসূত্র না থাকায় অনেক তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। বইয়ের অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে।

.

সম্ভবত বুঝার সুবিধার্থে লেখক বইটিতে একই বাক্য একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে গিয়ে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা লেখাকে প্রভাবিত করেছে বলে আমার মনে হয়েছে। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ এমপি।

.

বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এর সাবেক প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য এর লেখার সাথে আমার প্রথম পরিচয় এই 'পলাশী থেকে মুজিবনগর' বইয়ের মাধ্যমে।

আশা করি বইটি সবার জন্য সুখপাঠ্য হবে।

.

বইঃ পলাশী থেকে মুজিবনগর

লেখকঃ নিখিল ভট্টাচার্য

প্রকাশকালঃ ২৬ মার্চ ২০২১

প্রকাশকঃ শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্য (০৮৩১-৫২৩৭৪)

প্রচ্ছদঃ অবিনাশ আচার্য

মূল্যঃ ৩০০ টাকা/ আট ডলার

পৃষ্টাঃ ৩২০

কবিতাঃ পৃথিবী সুস্থ হবে

পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে যেমন হুট করে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠি,

তেমনভাবে হয়তো কোনো একদিন বাধভাঙ্গা উল্লাসে ফেটে পড়ব না।

অ্যান্টিবডি গুলো ধীরে ধীরে সক্ষমতা অর্জন করবে,

ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে কিংবা প্রাকৃতিকভাবে।

জনচলাচল হবে স্বাভাবিক

করোনা মহামারী কেটে যাবে নীরবে।

পৃথিবী হবে সুস্থ,

গলা ছেড়ে গাইব সবাই,

বিজয়ের গান।

পরনির্ভরশীল আমরা!

গত এক বছরে পরিচিত অনেকের মৃত্যুতে যে বিষয়টি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি সেটি হলো, আমাদের পরিবারগুলোর অন্যতম একটি বড় সমস্যা হলো সব সদস্যদের একজনের উপর নির্ভরশীল থাকা।

বেশিরভাগ পরিবারে দেখা যায় পরিবারের কর্তাব্যক্তি একাই ৪-৫ জনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে পুরোটা জীবন কাটিয়ে দেন। নিজের জীবন উপভোগ করা, নিজের স্বাদ আহ্লাদ এর দিকে নজর দেয়ার সময়ই হয় না। ফলে আমাদের অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজের কর্তাব্যক্তিরা অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যান।

পরিবারের সকল সদস্য একজনের উপর নির্ভরশীল থাকার কারণে হঠাৎ করে সেই ব্যক্তিটি অসুস্থ হলে কিংবা মারা গেলে পরিবারটি ভীষণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যায়। হয়তো অনেক পরিবার সেই দুঃসময় খুব ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারে।

এই চিত্রটি মধ্যবিত্ত পরিবারে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

.

এই নির্ভরশীলতার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় গ্রামীণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে। এসএসসি পাশ করার সাথে সাথেই পরিবার যাদের বিয়ে দিয়ে স্বামীর উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। যথেষ্ট শিক্ষিত না হওয়ায় ও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর শত নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়, দাসত্ব স্বীকার করতে হয়।

যদি নির্যাতন সহ্য না করে প্রতিবাদ করতে যায় অথবা স্বামীর আকস্মিক অসুস্থতা কিংবা মৃত্যু হয় তবে সেই মেয়েটি পূণরায় বাবার বাড়ির বোঝাতে পরিণত হয়।

.

অথচ যদি আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো একজনের উপর নির্ভরশীল না থেকে বর্হিবিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো সবাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারতো তবে দেশের চিত্র অনেক আগেই বদলে যেত।

আমার পরিচিত মাম্মাস গুড বয়, গুড গার্ল অনেকেই দেশের বাইরে গিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গেছে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট,ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। দেশে থাকলে তারা এখনো পরিবারের উপর নির্ভরশীলই থাকতো। ঐদেশের সমাজ, পরিবেশে তারা তাদের পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠেছে।

শুধু দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবার নয়, আপনি অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ পরিবারের সদস্য হলেও আপনাকে স্বনির্ভর হতে হবে। দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে হবে। আমার আশেপাশের অনেকেই পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার সাথে সাথে তথাকথিত বড় হয়ে উঠা কিংবা চাকরির যোগ্যতা অর্জনের আগেই বিভিন্ন অনলাইন,অফলাইনে ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন, স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এই যে যাত্রা আপনারা শুরু করেছেন আপনাদের সালাম জানাই।

পরিবর্তন আসুক।

Optical Character Recognition

ধরেন আপনার বস/স্যার/সিনিয়র আপনাকে একটা কাগজ/বই/পিডিএফ দিয়ে এটা টাইপ করতে বললো। কিংবা আপনার নিজের ব্যক্তি প্রয়োজনে খাতায়/বইয়ে লেখা আছে এমন কোনো লেখা পুণরায় টাইপ করার প্রয়োজন হল।

কি করবেন?

৯০ দশকের মতো কাগজ/বই দেখে দেখে টাইপ করা শুরু করে দিবেন। সাধারণত সবাই এটাই করে!

.

কিন্তু এইটা তো ২০২১! নব্বই দশকের সব যদি এই সময়েও অনুসরণ করেন তাহলে কি মনে করেন সময়ের সাথে টিকে থাকতে পারবেন?

.

সহজ সমাধান শুনেন, OCR বা Optical Character Recognition এর মাধ্যমে প্রতিটা শব্দ টাইপ না করেই আপনার টাইপিং সমাপ্ত করতে পারবেন।

.

ভাই এইটা কিভাবে করে?

এই সম্পর্কিত অসংখ্য এপস/ওয়েবসাইট গুগল কিংবা প্লেস্টোরে পাবেন।

এপসগুলো ডাউনলোড করুন, যে পৃষ্টা টাইপ করতে চান ঐ পৃষ্টার ছবি তুলুন এবং অটোমেটিক টেক্সট ফরম্যাট পেয়ে যাবেন।

.

বাংলা এবং ইরেজি OCR এর জন্য অসংখ্য এপস/ওয়েবসাইটের মধ্যে সেরা একটি এপস হলো গুগল লেন্স। আরেকটি CamScanner. এন্ড্রয়েড ইউজ না করে থাকলে ocr online সার্চ দিন, অনেক ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন।

ছবি তুলে কিংবা পিডিএফ দিয়ে আস্ত একটি বইকে যেখানে ৫ মিনিটে লিখিত টেক্সট ফরম্যাটে পেয়ে যাবেন, সেখানে কেন অযথা ৫ ঘন্টা সময় নষ্ট করে টাইপ করবেন?

.

আশেপাশে থাকা যে কোনো একটি বই এর কয়েকটি পৃষ্টা কে টেক্সট ফরম্যাটে এখনই নিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

একাডেমিক পড়াশোনা একটি গর্হিত কাজ

'আরেহ আমিতো পরীক্ষার আগের রাত্রে দেখি বই-ই এখনো কিনি নাই!'

আপনি যখন আপনার জুনিয়রকে/বন্ধুকে গর্বভরে এই গল্প শুনাচ্ছেন তাতে কি আপনার মনে হয়, সেই জুনিয়র/বন্ধুটির কোনো উপকার করছেন? বা এটি কি আদৌও গর্বের কাজ?

সম্ভবত একজন জুনিয়র/বন্ধুর জীবনে যতটুকু ক্ষতি করা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছেন আপনার এই কথাগুলোর মাধ্যমে।

.

এই যে 'একদমই পড়ি নাই, বই-ই কিনি নাই, বই-ই খুলি নাই' এই বিষয়গুলো কুলনেস হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি আমরা! যে যত বেশি এই বিষয়ে অভিনয় করতে পারে গ্রুপের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি কুল!

.

কেউ যদি আমাদের সাথে পড়া নিয়ে কোনো কথা বলতে আসে, আমরা তাকে আঁতেল,পন্ডিত,শিক্ষিত প্রভৃতি উপাধি দিয়ে মজার পাত্র বানাই!

.

আপনি যদি ভালো রেজাল্ট করেন, তাহলে হয়তো আপনি ভালোভাবে পড়ালেখা করেছেন অথবা ভালোভাবে পড়ালেখা করা আপনার কোনো বন্ধুর লেখা নকল করেছেন।

একদম না পড়ে আমরা পরীক্ষায় টপ করতে চাই! যে কোনো উপায়ে! না পড়ে পরীক্ষায় টপ করাটাই যেন আসল স্মার্টনেস! কিন্তু বিশ্বাস করেন, দিনশেষে এটা আপনার কোনো উপকার করছে না। কারন, না পড়ে কেউ ভালো রেজাল্ট করতে পারে না।

.

যে এলাকায় এই 'পড়ালেখা না করাটাই কুলনেস' প্রবণতা বেশি সেই এলাকায় 'পড়ালেখার পরিবেশ' তত বেশি নষ্ট হচ্ছে। এবং অসংখ্য বিষয়ের পাশাপাশি এই পড়ালেখাকে একটা গর্হিত কাজ বানিয়ে ট্রল করাটা কিন্তু দিন শেষে জন্ম দিচ্ছে আমার মতো গর্দভ অসংখ্য ছাত্র। জন্ম দিচ্ছে উচ্চ ডিগ্রিধারী অথচ মূর্খ এক প্রজন্ম!

চিরস্থায়ী হোক লটারির মাধ্যমে সরকারি স্কুলের ভর্তি প্রথা।

ভর্তি পরীক্ষার নামে প্রতি বছর কোমলমতি শিশুদের উপর মানসিক নির্যাতন করা হয় যা দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকাকালীন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমরা।

এক শ্রেণীর ব্যাবসায়ীরা এই পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যায়। আর জেলার সব মেধাবীদের বাচাই করে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। বাকি বিদ্যালয় গুলোতে দ্বিতীয় সারির শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। যা শিক্ষায় বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অসমতা সৃষ্টি করে।

.

আর অমুক স্কুলে পড়ার কারনে আমি মেধাবী এই একটা চিন্তা শিক্ষার্থীদের মাথায় ডুকিয়ে দেয়া হয়। ফলে অন্য বিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিচু মনে করে, যা তাদের শিক্ষাজীবনে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।

.

স্কুল নিয়ে মফস্বলে যে ধারনা, যদি চিরস্থায়ী ভাবে এই লটারি প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়, তাহলে মা বাবা আর সমাজ সবার মন মানসিকতা পরিবর্তন হতে বাধ্য। ঠিক যেমনটা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তি করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার নামে অযথা কোনো মানসিক চাপ, দৌড়াদৌড়ি, ব্যবসা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

.

তবে এই প্রক্রিয়া চিরস্থায়ী না হলে শুধু এই বছরের জন্য হলেই, ২০২১ সালের মেধাবী কিংবা পরিশ্রমীদের জন্য এটা অমানবিক সিদ্ধান্ত হবে। কারন যারা এ বছর লটারির মাধ্যমে ভর্তি হতে পারে নাই, তারা হয়তো পুনরায় ভর্তির জন্য এক বছর গ্যাপ দিবে, অথবা স্কুল জীবনটা তথাকথিত দ্বিতীয় সারির স্কুলে, দ্বিতীয় সারির ছাত্রদের সাথেই কেটে যাবে।

.

চিরস্থায়ী হয়ে যাক এই লটারির প্রথা। তবে এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকাটা প্রয়োজনীয়। ভর্তি পরীক্ষার নামে বাচ্ছাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন বন্ধ হোক।

বাংলা ভাষা ও বর্তমান প্রজন্ম

বাংলা ভাষা নিয়ে বর্তমান সময়ে অনেক জল ঘোলা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, বাংলা ভাষায় হিন্দুয়ানী শব্দ বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলছে বাংলা ভাষায় আরবি,ফারসি শব্দ বেশী ব্যবহার করে বাংলাকে বিকৃত করা হচ্ছে।

.

অনেকে আবার ভাষাকে ধর্মের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছে। যেমন স্নান,জল এই শব্দগুলো শুধু হিন্দুরা ব্যবহার করবে। একইভাবে গোসল,পানি এই শব্দগুলো মুসলমানরা ব্যবহার করবে।

.

অনেকে ইংরেজী অক্ষরে বাংলা লিখছে যেমনঃ amar sunar bangla। অনেকে আবার বাংলা,ইংরেজী,হিন্দি,উর্দু এক বা একাধিক ভাষার শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার করছে।

.

কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার জন্য বন্ধুমহলে ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হচ্ছে।

আবার অনেকে সচেতনতা সৃষ্টি করছে যে সামাজিকতা রক্ষা করতে কষ্ট করে কেন প্রমিত ভাষায় কথা বলতে হবে? আমরা আমাদের নিজের মায়ের ভাষায় (আঞ্চলিক ভাষা) কথা বলবো।

.

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বস্তরে বাংলা নিশ্চিতের তাগিদে বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশনা প্রদান করে হাইকোর্ট। কিন্তু বর্তমানে সাইনবোর্ড-বিলবোর্ড সব জায়গা ইংরেজী ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে।

.

বাংলা ভাষা নিয়ে এসব তর্ক বির্তক দেখে অনেকে আবার আক্ষেপ করে বলে "এসব দেখার জন্যই কি আমাদের পূর্বপুরুষেরা রাজপথে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ভাষা আন্দোলন করেছিল?"

.

বর্তমান প্রজন্ম কিংবা অনেকের ভাষায় দুই শব্দ যোগ করে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ডুবে থাকা বর্তমান প্রজন্মকে অনেকে বাংলা ভাষার তথাকথিত বিকৃতির জন্য দায়ী করে থাকেন।

.

কিছু দিন আগে মানুষের দোকানে ইংরেজিতে লেখা সাইনবোর্ডে (Bata, Oppo) লাল কালি, রং দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা।

.

সব জীবন্ত ভাষা যেখানে পাহাড়ি নদীর মতো গতিশীল, সেখানে ভাষাকে কি কোনো বাধ্যবাধকতা দিয়ে আটকে রাখা যায়?

.

সব জীবিত ভাষা গতিশীল, যা ভাষাকে করে সংস্কৃত, আধুনিকতর। ফলে বানান পরিবর্তিত হয়, অব্যবহৃত শব্দ বাদ পড়ে,পারিভাষিক শব্দ এসে যোগ হয়।

.

দুইশত বছর আগের বাংলার সাথে বর্তমান বাংলার অবশ্যই অনেক পার্থক্য রয়েছে।

দুইশত বছর পরে বাংলা ভাষা কেমন থাকবে সেটা সময়ই বলে দিবে। কেউ এখনই বাধ্যবাধকতা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না।

.

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে নিয়ম করে, জোড় জবরদস্তি করে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন করা যাবে না। যেখানে বহিঃবিশ্ব দূরে থাক দেশের মধ্যেই উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজি ব্যবহার করা হয়। সেখানে নতুন প্রজন্ম নিজের জীবনের প্রয়োজনেই ইংরেজি শিখছে এবং স্বাভাবিকভাবেই বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণ ঘটাচ্ছে।

ভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকলে, নতুন প্রজন্মকে দোষারোপ না করে যদি সম্ভব হয় তবে উচ্চশিক্ষা সহ সবক্ষেত্রেই বাংলার প্রচলন করুন। যেন বাংলা এমন একটা ভাষা হয়, যার বিকল্প হিসেবে দ্বিতীয় কোনো ভাষা ব্যবহার করা না লাগে। রোগের লক্ষন দেখে হাউমাউ করে না কেঁদে রোগের ভাইরাসকে সমূলে উপড়ে ফেলুন।

.

অথবা ভাষাকে সময়ের কাছে সমর্পণ করুন। সময় ভাষাকে ভাষার আপন গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(লেখাটি মুক্তাঞ্চলের একটি গ্রুপ প্রজেক্টে লেখা)

বইয়ের স্মৃতি

টিফিনের টাকা জমিয়ে সপ্তাহ অপেক্ষা করে সেবা প্রকাশনীর তিন গোয়েন্দা/মাসুদ রানা পড়া কিংবা হুমায়ূন আহমেদের হিমু সমগ্র পড়ে হিমু হবার চেষ্টা করা এমন কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই। পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়ার জন্য কোনো উৎসাহ কিংবা অনুপ্রেরণা আমি আমার পরিবার কিংবা আশেপাশের পরিবেশ থেকে পাই নি। বরং চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়েও দিন আট-দশ ঘন্টা পড়ি কিংবা না পড়ি মায়ের ঝাঁটার ভয়ে পাঠ্যবইয়ের সামনে বসে থাকতে হতো। প্রথমেই অকপটে এই সত্যগুলো স্বীকার করে নিচ্ছি।

.

মাঝে মাঝে বাবা বই মেলা থেকে ঈশপের গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি কিংবা টম এন্ড জেরির মতো কিছু বই কিনে আনতেন। বাল্যকালে এর চেয়ে বেশী স্মৃতি নেই আমার বইয়ের সাথে। তবে বই পড়ার প্রতি আমি আগ্রহী ছিলাম ছোট বেলা থেকেই। মাঝে মাঝে টাকা জমিয়ে হবিগঞ্জের তিনকোনা পুকুর পাড়ে অবস্থিত মুক্তি গ্লাস হাউজ থেকে বই কিনে আনতাম, যেগুলোর মূল্য ছিল মাত্র দশ থেকে বিশ টাকা। এছাড়াও প্রায়শই বিকালে স্টাফ কোয়ার্টার পৌর সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে পত্রিকা কিংবা বই পড়তাম যার বেশিরভাগই বয়স কম থাকার কারনে বুঝতাম না। একটা পত্রিকা পেলে সেটার প্রথম থেকে শেষ- ‘জমির বিজ্ঞাপন’ কিংবা ‘পাত্র-পাত্রী চাই’ পুরোটাই পড়ে ফেলতাম। আমার আশেপাশে এমন কেউ ছিল না যে আমাকে দেখিয়ে দিবে কোন বই আমার বয়স উপযোগী কিংবা কোন বই পড়লে আমার উপকার হবে। পারিবারিক সাপোর্ট? একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কিংবা সাহিত্যের বই পড়া কোনো বিষয়েই আমি সেটা পাই নি।

.

এসএসসি পরীক্ষার পর অবসর সময়ে আরিফ আজাদের প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ সহ আরো কয়েকটি বই পড়ি। আমার বই পড়া পুরোদমে শুরু হয় একাডেমিক পড়ালেখার জন্য হবিগঞ্জ ত্যাগ করে সিলেট গিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর। সিলেট থাকার প্রথম ছয় মাসে পড়ি ৬৩ টি বই! প্রথম দিকে পড়া বইগুলোর মধ্যে সেবা প্রকাশনীর তিন গোয়েন্দা-মাসুদ রানা, হুমায়ূন আহমেদের হিমু সমগ্র-মিসির আলী সমগ্র-শুভ্র সমগ্র-নন্দিত নরকে-শঙ্খনীল কারাগার-দেয়াল-জোছনা ও জননীর গল্প, জাফর ইকবালের আমি তপু-আমার বন্ধু রাশেদ, আবুল আসাদের সাইমুম সিরিজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর টেনিদা সমগ্র, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শাহাদুজ্জামানের ক্রাচের কর্ণেল, অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের বাংলাদেশ ও রক্তের ঋণ, সমরেশ মজুমদারের সাতকাহন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর দূরবীন এই বইগুলো নাম মনে হচ্ছে।

.

২০১৮ থেকে ২০২০ সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে তিন শতাধিক বই পড়ি। যার বেশীরভাগ বই ছিলো পিডিএফ।

অনেকগুলো বই আমাকে খুব বেশী প্রভাবিত করতো। বই পড়ার পর এক দুই দিন ঘোরের মধ্যে থাকতাম। কারো সাথে বইটি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু আমার আশেপাশে এমন কেউ ছিল না যে বই নিয়ে আগ্রহী।

.

২০২০ সালের ৬ জুলাই ‘মুক্তাঞ্চল’ – সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র (হবিগঞ্জ) এর সাথে যুক্ত হওয়ার পর অনেক ভালো মনের ও ভালো মানের পাঠকদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। সাহিত্য,সাহিত্যিক,বই সহ সবকিছু নিয়ে আড্ডা-আলোচনা সবকিছু করার সুযোগ করে দেয় মুক্তাঞ্চল পরিবার। মুক্তাঞ্চলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বই আদান প্রদান করার ফলে সবার বইয়ের খরা কেটে যায়। একজন ইচ্ছে হলেই বই পড়তে পারে। বই পড়ার অভ্যাস নেই এমন অনেকেও মুক্তাঞ্চলে যুক্ত হওয়ার পর প্রথম ২ মাসেই পনের থেকে বিশটি বই পড়ে নেয়। বর্তমানে মুক্তাঞ্চল পরিবারের সাথেই চলছে বই পড়া, বইয়ের অনুভূতি আদান প্রদান।

.

বইয়ের স্মৃতি শিরোনামের লেখায় পাঠ্য বই এর স্মৃতি যুক্ত করতে চাই না। পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়ার বয়স সবেমাত্র তিন-চার বছর। প্রতিনিয়ত বইয়ের সাথে স্মৃতি যুক্ত হচ্ছে, স্মৃতির ডায়েরি সমৃদ্ধ হচ্ছে যা হয়তো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

.

বই হোক বন্ধু,

বই হোক জীবনের নিত্যসঙ্গী,

বই হোক শ্রেষ্ঠ উপহার।

বই কিনুন, বই পড়ুন, বইয়ের সাথেই থাকুন।

২০২০

পরীক্ষায় প্রথম ফেইলের স্মৃতি

তখন আমি বাংলাদেশে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

জেলার সেরা স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে চান্স পাবার সুবাধে বাসা থেকে পড়ালেখার জন্য খুব চাপ দেয়া হলো। বাসা থেকে বলা হয়েছিলো যে পরীক্ষার পর ২ দিন সম্পূর্ণ ছুটি দেয়া হবে!

সেটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সর্বশেষ পরীক্ষা, বিষয় ছিল তুলনামূলক সবচেয়ে সহজ ধর্মশিক্ষা। যেহেতু শেষ পরীক্ষা, তাই পরীক্ষার পর কিছুদিনের ছুটি পাব।

২০ মার্ক আন্সার করার পর আমার মাথায় শুধু ঘুরতে থাকল যে পরীক্ষার হল থেকে বেরুলেই ছুটি। আর পড়তে হবে না কয়েকদিন। সেই চিন্তায় ও ছুটি পাবার উত্তেজনায় আর লিখতে পারলাম না এক মার্ক ও। খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম পরীক্ষা হল থেকে।

ফলাফল বাকি সব বিষয়ে ভালো মার্ক,শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষা বিষয়ে ২০ মার্ক পেয়ে জীবনের প্রথম অকৃতকার্য হয়েছিলাম। এবং ঐ বিষয়ে পুরো ক্লাসে একমাত্র আমি অকৃতকার্য হই! কি লজ্জা!

এখনো ভাবলে অবাক লাগে যে পড়াশোনার জন্য পরীক্ষা চলাকালীন এবং পরীক্ষার আগে সারা বছর কতটা প্রেসার ছিলো সেই সময়, যে মুক্তির আনন্দে কোনোকিছু চিন্তা না করে খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম!!

শেখ কামাল ও শেখ রাসেলের তুলনায় শেখ জামালকে নিয়ে কম আলোচনা হয় কেন?

শেখ কামাল ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি আতাউল গনি ওসমানীর এডিসি হিসেবে কাজ করেন। তিনি ঢাকা আবহানী এর প্রতিষ্ঠাতা। শেখ কামাল ছাত্রলীগ করতেন। ১৯৭৩ এর শেষের দিকে শেখ কামাল একটি গুলিবর্ষণে জড়িয়ে পড়েন যাতে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

জাতির জনকের বড় পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, আবহানী লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা, ছাত্রলীগ কর্মী, উনার বোন শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন যাবত রাষ্ট্রক্ষমতায়, এত কিছু কি যথেষ্ট নয় শেখ কামালকে নিয়ে এত বছর পরেও আলোচনা হওয়ার?

জীবিত অবস্থায়ই শেখ কামাল অনেক আলোচনা এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছিলেন, যা উনার মৃত্যুর পর ঢালপালা গজিয়েছে। অপরদিকে শেখ জামাল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন কমিশন প্রাপ্ত অফিসার।

বড় ভাই শেখ কামালের মতো জীবিত অবস্থায় আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিতে পারেননি।

আর শেখ কামাল বড় সন্তান হিসেবে স্বভাবতই দেশের নজড়টা বেশি শেখ কামালের দিকেই থাকত।

এবার আসি শেখ রাসেল সম্পর্কেঃ

শেখ রাসেল ছিলেন জাতির জনকের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ছিলেন জাতির জনকের অতি আদরের। পরিবারের ছোট সদস্য হিসেবে বাবার হাত ধরে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। রাসেল নামটি রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই। বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক নোবেল পুস্কারপ্রাপ্ত বার্ট্রান্ড রাসেলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখলেন শেখ রাসেল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র থাকাকালীন মাত্র ১১ বছর বয়সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সসদ্যদের সঙ্গে ঘাতকদের হাতে হত্যার নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি।

একটি দেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বপরিবারে হত্যা করা হলো। বাদ গেল না ১১ বছরের ছোট্ট শিশুটি।

শেখ রাসেল পরিবারের ছোট বিধায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেও শেখ রাসেল নামটি আবেগের।

শেখ রাসেলের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই কেদে ফেলেন।

হয়তো প্রধানমন্ত্রীর এই আবেগকে ব্যবহার করে ফায়দা নিতে কিছু সুবিধাবাজ যতত্রত শেখ রাসেল নামটি ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন কলাম লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখায়ও উঠে এসেছে শেখ রাসেলের নাম।

এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে শিশুদের কল্যানে দেশব্যাপী করা বিভিন্ন প্রজেক্ট শেখ রাসেলের নামে করা হয়েছে। যেমনঃ উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ।

আর স্বভাবতই আপনার চারপাশে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে পরিবারের বড় ছেলে এবং ছোট ছেলেদের তুলনায় মেঝো কিংবা সেঝো ছেলেরা একটু কমই আলোচনায় থাকেন।

ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তর

ভাসানচর মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জেগে ওঠা বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বর ইউনিয়ন এর অন্তর্গত। মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ভাসানচরে তাদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে।

এক লাখ রোহিঙ্গার আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় দুই হাজার ৩১২ কোটি ১৫ লাখ টাকা ধরা হয়। নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নের ভাসানচরে এক লাখ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা এবং দ্বীপটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে নিয়ে আসার পিছনে রাজনৈতিক কারন রয়েছে।

এটা অস্থায়ী আশ্রয় বলা হলেও এটাই হবে রোহিঙ্গাদের জন্য স্থায়ী নিবাস।

একটা দেশের সরকার যখন শরণার্থীদের ফেরত পাঠাতে চায়, তখন তাদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকাতেই রাখবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের নিজ ভূখন্ডের একদম ভিতরে নিয়ে আসছে।

এর কারনটা কি অনুমান করা যায়?

স্বাধীনতার ঘোষক

১.

আগামীকাল সারাদেশে সাবেক বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডাকলেন।

এনটিভির সংবাদ পাঠিকা ফারহানা নিশো সন্ধ্যার সংবাদে এই ঘোষনাটি পড়ে শুনালেন।

হরতাল ডাক দেয়া মানুষটি আসলে কে?

খালেদা জিয়া না সংবাদপাঠিকা ফারহানা নিশো??

অবশ্যই হরতাল ডাক দেয়া মানুষটি বেগম খালেদা জিয়া।

২.

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষনা করলেন।

তার পক্ষ থেকে বেতারে প্রথমে এম এ হান্নান ও পরে মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষনা পত্রটি পাঠ করলেন।

তাহলে স্বাধীনতার ঘোষক কে?

বঙ্গবন্ধু নাকি এম এ হান্নান বা জিয়াউর রহমান?

অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সিয়েরা লিওন এর দ্বিতীয় মাতৃভাষা বাংলা??

একটি বিতর্ক দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন এর ২য় মাতৃভাষা কি বাংলা?

যা আমরা ছোটবেলা থেকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ে 'জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান' অংশটিতে পড়ে আসছি।

.

ড. মোহাম্মদ আমীন একটি ওয়েবসাইটে লিখেছেন,

" আমার জ্ঞানমতে, এমন কোনো তথ্য বাংলাদেশ সরকারের জানা নেই। অথচ, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে আমি প্রশাসনে কাজ করে আসছি। এরূপ কোনো প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার কখনো সিয়েরা লিওন সরকারের কাছে পাঠায়নি। পাঠাবেনই বা কেন? এমন কোনো হেতুর তো উদ্ভব হয়নি। আর সিয়ের লিওন সরকারই বা বাংলাকে কেন রাষ্ট্রভাষা করতে যাবে? ওখানকার কেউ তো বাংলায় কথা বলে না। একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যেসব কারণ থাকে এবং যেসব প্রাসঙ্গিক কাজ করতে হয় তা কখন হলো? কীভাবে হলো? এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে বা সরকারিভাবে কখনও কিছু বলা হয়েছে- এমন কিছু আমার জানা নেই।"

.

> শুবাচের অন্যতম সঞ্চালক প্রমিতা তার গবেষণার অংশ হিসেবে সিয়েরা লিওনের ত্রাণমিশন বীক্ষণ করতে গিয়েছিল। তার অভিমত, “বাংলা সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রভাষা— এটি হাস্যকর। নিশ্চয় কেউ উপহাস করে বলেছে। বাংলা সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রভাষা নয়। সে নিশ্চিত করেছে, “এমন কোনো ঘোষণা সম্পর্কে সিয়েরা লিওনের কেউ অবহিত নন।”

.

একটি গ্রুপে মুরশেদ আলম নামে একজন লিখেছেন, ‘বাংলা’ সিয়েরা লিওন-এর দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নয়। এ সম্পর্কিত কোন অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট আমার চোখে পড়েনি। মূলত পাকিস্তানি একটি নিউজ পোর্টাল (www.dailytimes.com.pk) প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর ভিত্তি করে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। Bangla Made One of The Official Languages of Sierra Leone – 2002-12-27 এই শিরোনামে নিউজ পোর্টালটি গুজবটি ছড়ায়। পরবর্তীকালে ওই পোর্টালটি এটি সরিয়ে নেয়। আফসোস! আমাদের দেশীয় কিছু গণমাধ্যম এর পাশাপাশি; উইকিপিডিয়া ও এই ভুল তথ্যটি এখন পর্যন্ত আপডেট রেখেছে।”

.

এবার দেখে নেই উইকিপিডিয়া কি বলে?

'Languages of Sierra Leone' শিরোনামে উইকিপিডিয়াতে একটি পেইজ আছে যাতে লেখাঃ

> "Sierra Leone is a multilingual country. English is the de facto official language, and Krio is the most widely spoken.
>
> After the contribution made by the Bangladesh UN Peacekeeping Force in the Sierra Leone Civil War under the United Nations Mission in Sierra Leone, the government of Ahmad Tejan Kabbah declared Bengali an honorary official language in December 2002."

.

উইকিপিডিয়াতে তথ্যসূত্র হিসেবে প্রথমে পাকিস্তানি একটি নিউজ পোর্টালকেই দেখাচ্ছে, এবং ঐই ওয়েব পোর্টাল থেকে তথ্যটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যা মুরশেদ আলমের দাবির সাথে মিলে যায়! এছাড়াও উইকিপিডিয়াতে তথ্যসূত্র হিসেবে বাংলাদেশী এবং ইন্ডিয়ান কয়েকটি নিউজপেপার এর লিংক দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর প্রকাশকাল ২০১৭ সালের দিকে!! কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তারা তথ্যটি দিতে পারে নি।

.

এবার চলুন দেখে নেই সিয়েরা লিওন এর সংবিধান কি বলে?

সিয়েরা লিওন এর সংবিধানে বাংলা ভাষার কোনো উল্লেখ নেই!

সংবিধান লিংকঃ https://wipolex.wipo.int/fr/text/230009

.

তবে দেশের পাঠ্যবইয়ে আমাদের যা শিখানো হচ্ছে, উইকিপিডিয়া সহ বিভিন্ন নিউজপোর্টালে যে তথ্য দেয়া হচ্ছে তার সবটাই কি ভুল?

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের কিছু জানায় তবেই আমরা ধোয়াশা থেকে মুক্ত হতে পারি।

.

আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসি ও সম্মান করি। কোনো দেশের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা হোক কিংবা না হোক তাতে আমাদের মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা কোনো অংশে কমে যাবে না।

.

উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা – হবিগঞ্জবাসী অবহেলিত

২০১০ সালে যখন হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই, সেই বছর হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বিকেজিসি বালিকা বিদ্যালয় ডাবল শিফট চালু হয়।

.

সেই বছর শুনেছিলাম খুব শীঘ্রই নাকি এই দুই স্কুলকে কলেজে রুপান্তরিত করা হবে।

অভিভাবকরা তখন আমাদের বলতেন আমরা কলেজে যেতে আরো ৮ বছর বাকি। এর ভিতরে অবশ্যই কলেজ হয়ে যাবে, আমরা হয়তো Habiganj Govt. High School & College এ আমাদের কলেজ জীবন কাটাতে পারবো।

.

৮ বছর পেরিয়ে আজ ১০ বছর হয়ে গেল, আমরা স্কুল পেরিয়ে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছি এখনো শুনি যে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিকেজিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কলেজে রুপান্তরিত হবে।

হবিগঞ্জ জেলায় কলেজ আবেদনের সর্বোচ্চ যোগ্যতা জিপিএ ৪.০০। যেখানে ২০২০ সালে হবিগঞ্জ জেলা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬০০ জন! জিপিএ-৪ এর উপর আবেদন করার মতো কোনো সরকারি/বেসরকারি কলেজ জেলায় নেই।

জেলার একমাত্র ভালো মানের কলেজ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ।

যে কলেজে ভর্তি হতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হত শিক্ষার্থীদের।

এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়ে বাহিরের জেলা থেকেও শিক্ষার্থীরা এসে এই কলেজে ভর্তি হয়।

.

বৃন্দাবন কলেজে যদি ভর্তি হতে না পারা যায়, তবে শহরে ভর্তি হওয়ার মতো দ্বিতীয় চয়েজ হিসেবে ভালো মানের সরকারি/বেসরকারি কোনো কলেজ নেই।

সেক্ষেত্রে ধনী পরিবারের সন্তান হলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা জেলার বাইরে চলে যায়। আর গরিব পরিবারের সন্তান হলে???

.

হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বিকেজিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজে রুপান্তরিত করাটা এবং হবিগঞ্জে মানসম্পন্ন কলেজ কতটা প্রয়োজন তা এইবছর সদ্য এসএসসি দিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলেই বুজতে পারবেন। বিগত ৪/৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী সবাই এর ভুক্তভোগী।

আশা করি কর্তৃপক্ষ এবং বিত্তবানরা এ বিষয়ে সদয় দৃষ্টি জ্ঞাপন করবেন।

নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নারীদের প্রতি অসম্মান নয় নি?

মহান জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনে মহিলাদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকার পরেও ৫০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে।

কেবলমাত্র জাতীয় সংসদ নয়, এলাকার কাউন্সিলর নির্বাচন থেকে গ্রামের মেম্বার নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকার পরেও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে।

এটা নারীদের প্রতি এক ধরনের দয়া দেখানো। নারীরা যে দুর্বল সেটা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। নারীবাদীদের উচিত এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া। শুধু "নারী" বলেই বিশেষভাবে ট্রিট করতে হবে, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তোলা উচিত।

প্রজাতন্ত্রের কথিত চাকররা বাংলাদেশে রাজা

ঘটনাটি সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল এর।

.

কিছুদিন আগে বন্ধু Shawon এর দাদা হাসপাতালে ভর্তি থাকার উনাকে দেখতে রাতে হাসপাতাল যাই। আমি, MD Khalilur মুস্তাক ভাই, শাওন।

.

যাওয়ার পরে দাদার প্রেসক্রিপশন দেখানোর জন্য ওয়ার্ডের সামনে যেখানে ডাক্তার,নার্সরা বসা থাকে সেখানে যাই।

সেখানে একজন লোক সিভিল ড্রেসে বসা ছিল।

আমি গিয়ে উনাকে ভাইয়া সম্বোধন করে প্রেসক্রিপশন দেখার জন্য বলি।

উনি আমাকে উত্তর দেন যে উনি প্রথম শ্রেণীর বিসিএস কর্মকর্তা। উনাকে আমি ভাইয়া বলে কেন সম্বোধন করলাম, উনাকে স্যার কেন ডাকলাম না।

.

উনি সিভিল ড্রেসে ছিলেন, গায়ে এপ্রোন ছিল না। তখন আমি বলি যে আপনার গায়ে এপ্রোন নেই, আমি আপনি ডাক্তার না নার্স সেটা চিনব কিভাবে?

তখন মোস্তাক ভাই বলে যে প্রেসক্রিপশনটা দেখে দিন।

প্রেসক্রিপশন দেখার পর আমরা ফিরে আসার সময় মোস্তাক ভাই উনাকে ধন্যবাদ "ভাইয়া" বলে চলে আসেন।

.

উনাকে আমরা সে দিন পরিচয় দেয়ার পরেও স্যার ডাকি নি।

.

কিছু দিন আগে ফেইসবুকে একটা ভাইরাল ছবিতে দেখলাম কোনো এক হাসপাতালের নার্স এবং ওয়ার্ডবয়রা হাসপাতালের দেয়ালে কাগজে লিখে দিসে যে "নার্স এবং ওয়ার্ডবয়দেরকেও স্যার ডাকতে হবে।

.

মানে ওনারা দেশের সাধারণ জনগনকে পাইসে টা কি?

স্যার না ডাকলে জোর করে স্যার ডাকিয়েই ছাড়বে অবস্থাটা এমন!

.

গত কয়েকদিন আগে 'স্যার' না ডাকায় সাংবাদিকের উপর ক্ষেপেছেন দিরাইয়ের ইউএনও!

.

স্যার না ডাকার কারনে অপ্রীতিকর এমন অসংখ্য নিউজ হয় প্রতিনিয়ত। যত্তগুলো নিউজ হয় বেশিরভাগই সাংবাদিকদের সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনি।

 অনুমান করুন গ্রামীন দরিদ্র সহজ সরল মানুষ যারা সেবা নিতে তাদের দরবারে যান, স্যার না ডাকার কারনে উনাদের কেমন ভোগান্তি পোহাতে হয়!

.

অথচ কে কারে স্যার ডাকার কথা ছিল?

আমার বাবা ও একজন সরকারি চাকুরিজীবী।

সরকারের বেতনভুক্ত সবাই হলেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী।

হাইকোর্ট এর ভাষায় 'রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউই ভিআইপি নন, সবাই প্রজাতন্ত্রের চাকর।'

রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইনে কোথাও কাউকে স্যার ডাকার বাধ্যবাধকতা নেই।

.

আমাদের রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী। যে দেশের সংবিধানে জনগনকে সকল ক্ষমতার উৎস বলা হয়েছে, সরকারি চাকুরিজীবীরা জনগনের সেবাদাতা, সেখানে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সাধারণ জনগনকে স্যার ডাকার কথা!

.

আর মহামান্য হাইকোর্ট সুস্পষ্টভাবে দুটি বলেই দিয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের চাকর"।

গল্পঃ জন্মলিখন

"প্রিয় মা-বাবা,

আমি অনির্বান, এবং আমি নাফিসা।

আমরা দুজন একসাথে বসে, আমি অনির্বান যখন তোমাদের উভয় পরিবারের উদ্দেশ্যে চিঠিটি লিখছি, এবং চিঠিটি যখন তোমরা পড়ছ, তখন আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক দূরে চলে যাব, কিন্তু চিঠিটি পড়ে যেন তোমরা নতুন করে ভাবতে পারো, তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পার, সে উদ্দেশ্যেই লেখা।

.

কুয়াশাচ্ছন শীতের এক সকালে শহরের বিখ্যাত একটি ক্লিনিকে ১ ঘন্টা ব্যাবধানে আমাদের জন্ম হয়।

আমাদের শুধু একই এলাকায় একই ক্লিনিকে একই দিনে জন্ম হয় নাই, একই স্কুল, একই কলেজ পার করে কাকতালীয়ভাবে আমরা একই বিশ্ববদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছি। দীর্ঘ ২৫ বছর আমরা একে অপরকে পাশে থেকে দেখছি, একসাথে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছি, একে অপরকে ভালবেসেছি।

দিনে দিনে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। অনেক আকুতি মিনতি, আমাদের কারো চোখের জলে তোমাদের মন এতটুকু নরম হয় নাই। যা হয়েছে সেটা হলো দুই পরিবারের মধ্যে সমানুপাতিক হারে শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একে অপরের পরিবারে শুধু আমরা নিজেরাই অপমানিত হই নি, পুরো পরিবার অপমানিত হয়েছে।

আমাকে নাফিসার মা বলেছে যে, আমরা যদি পরিবারের অমতে বিয়ে করি, তাহলে উনি আত্মহত্যা করবেন।

আমাদের জন্য কোনো পথই তোমরা খোলা রাখ নি।

.

জন্মের সাথে সাথে আমাদের একটা ধর্মীয় নাম দেয়া হলো, ধর্মীয় দীক্ষায় দিক্ষিত করা হলো। পরিবার ও সমাজ আমাদের ছোট মস্তিষ্কে এটা গেঁথে দিল যে আমাদের ধর্মই সেরা ধর্ম বাকি হাজার হাজার ধর্মের সব মানুষরা পথভ্রষ্ঠ।

হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারনে আমাদের একজনের নাম হয় অনির্বান রায়। মুসলমান পরিবারে জন্ম নেয়ায় একজনের নাম হয় মানসুরা নাফিসা।

অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথেই আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল আমরা কে মসজিদে যাব, আর কে মন্দিরে যাব!

দুইজন দুই ধর্মের পরিবারে জন্মগ্রহণ করাটাই কি আমাদের একমাত্র দোষ ছিল?

জন্ম থেকে আমরা দুইজনে দুই ধরনের জীবনধারায় বেড়ে উঠেছি। নাফিসা প্রায়শই আমাকে বলত যে তার ধর্ম ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ট ধর্ম, সত্য ধর্ম। নাফিসা যেভাবে তার ধর্মকে সর্বদা সত্য ধর্ম বলত, আমিও আমার সনাতন ধর্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সত্য ধর্ম বলে মনে করতাম ও বিশ্বাস করতাম। ছোট থেকেই আমরা যে সমাজে বেড়ে উঠেছি সে সমাজ আমাদের দুইজনেরই মস্তিষ্কে গেথে দিয়েছিল যে আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ও সত্য ধর্ম।

কিন্তু সত্য তো কখনো দুইটি হতে পারে না!

.

আচ্ছা যদি এমন হতো যে আমি অনির্বান মুসলিম পরিবারে এবং নাফিসা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করতাম তবে কি হতো?

যে আমি অনির্বান আজকে হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও সত্য মনে করি তখন সেই একই আমি অনির্বান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করলে মুসলিম ধর্মকে পৃথিবীর সেরা ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করতাম।

যে নাফিসা আজকে মুসলিম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও সত্য মনে করে তখন সেই একই নাফিসা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহন করলে হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর সেরা ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করতো।

.

আমি নাফিসাকে তার ধর্মের কিছু ভুল দেখাতাম, যা নাফিসার কাছে বিন্দুমাত্র ভুল মনে হতো না, একদম সঠিক মনে হতো, কারন সে এই বিশ্বাস ছোট থেকে লালন করে আসছে।

নাফিসা আমাকে আমার ধর্মের কিছু ভুল দেখাত, যা আমার কাছে বিন্দুমাত্র ভুল মনে হতো না, একদম সঠিক মনে হতো, কারন আমি এই বিশ্বাস ছোট থেকে লালন করছি।

নাফিসা প্রায়ই আমাকে দেখাতো যে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মানুষ নাস্তিক হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্ম গ্রহন করছে, অর্থাৎ আমার ধর্ম ভুল। ঠিক তেমনি আমিও নাফিসাকে দেখাতাম মানুষ ইসলাম ধর্ম ছেড়ে মানুষ নাস্তিক হচ্ছে, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করছে, অর্থাৎ তার ধর্ম ভুল।

আমরা এভাবে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে অপরকে বুঝাতাম যে আমার ধর্মই সেরা, তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ কর। কিন্তু আমরা কেউই নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতাম না। কারন আমরা উভয়েই নিজেকে শতভাগ সঠিক মনে করতাম।

তাহলে আমরা কে সঠিক ছিলাম এবং কে ভুল ছিলাম?

তোমরা যে এখন আমার চিঠিটি পড়ছ তুমি যে ধর্মের অনুসারী, সেই ধর্মই তোমার কাছে সঠিক মনে হবে। কিন্তু সত্য তো কখনো দুইটি হতে পারে না!

.

প্রিয় মা-বাবা,

লিখতে পারছি না আর, উপরের লেখাগুলো পড়ে হয়তো ভাবছো যে আমি তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, নাস্তিক হয়ে গেছি অথবা হয়তো কোনো একটা ধর্ম বেছে নিয়েছি। কষ্ট পেয়ো না, এতদিন ধর্ম নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে এতসব জল ঘোলা হওয়ার পরেও, আমরা উভয়েই নিজেদের বিশ্বাসে অটল রয়েছি যে আমার ধর্মই সেরা ধর্ম। যে বিশ্বাস আজীবন ধরে লালন করেছি, জন্মের পর থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবার ও সমাজ আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দিয়েছে, সেটি পরিত্যাগ করে, বৃত্তের বাইরে গিয়ে অন্য কোনো চিন্তা করাটা কি এতোই সহজ?

.

আমরা আমাদের বিশ্বাসে অটল থেকে একসাথেই চলে যাচ্ছি, যেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে না। তোমরা ও তোমাদের বিশ্বাসে অটল থেকো।

ভালো থেকে তোমরা সবাই। আর আমাদের ক্ষমা করে দিও। তোমাদের ছেলে মেয়ে কেউই তোমাদের দেয়া ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় নি।

.

ইতি,

তোমাদেরই অনির্বান এবং নাফিসা।

বাংলাদেশের জন্ম ১৬ ডিসেম্বর না ২৬ মার্চ?

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম?

বাংলাদেশ এর জন্ম কত তারিখ?

স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস কত তারিখ এটা নিয়ে কনফিউশান কেন?

পাকিস্তানি বাহিনী কেন ভারতীয় লেফটেন্যান্ট এর নিকট আত্মসমর্পণ করল?

আজ ১৬ ডিসেম্বর অনেকে শুভ জন্মদিন বাংলাদেশ লিখে পোস্ট দিচ্ছে!

ধারাবাহিক ভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি।

১) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে এবং পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রাক্কালে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ:

"এটিই সম্ভবত আমার শেষ বার্তা: আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের নিকট আমার আহবান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। যতদিন পাক হানাদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত না হয় এবং যতদিন আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হয় ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।"

লক্ষ্য করুন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ঘোষণা দিয়েছিলেন "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন"।

তার এ ঘোষণার মাধ্যমেই বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্ম তারিখ ও স্বাধীনতা দিবস ২৬ শে মার্চ।

২) তাহলে ১৬ ডিসেম্বর কি ছিল? ১৬ ডিসেম্বর যে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করল এইটা কি ছিল?

লক্ষ্য করুন ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর দেশে সরকার গঠিত হয়। যার নাম "মুজিবনগর সরকার"।

দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো, দেশে সরকার গঠন করা হলো। কিন্তু তখনো দেশের শকুনের মতো বসে ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি।

২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে এই দেশের জন্ম হয়ে গেছে। এ দেশের জমি বাংলাদেশের নামে ক্রয় করা হয়ে গেছে। এ দেশ আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, এ দেশ এখন বাংলাদেশ। এখন নিজের জমি অন্যলোকেরা দখল করে নিয়েছে, এ পর্যায়ে ঐ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে।

এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পেতে হবে। তবেই আসল বিজয় অর্জন হবে।

শুরু হয়ে গেল স্বাধীন দেশ থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযান "মহান মুক্তিযুদ্ধ"। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল।

আর আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও সমর্থন পেতে মুজিবনগর সরকার কাজ করা শুরু করলো।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির কারনে ভারত সরকার প্রথম থেকেই বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো।

যুদ্ধের শেষের দিকে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় বাহিনী, বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে।

যৌথ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় ভারতীয় লেফটেন্যান্ট জগজিৎ সিং অরোরা কে।

এতদিন একা মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করেছে। এখন দুই বাহিনী এক সাথে মিলে যৌথ বাহিনী গঠন করে যুদ্ধের গতি তরান্বিত করেছে।

৬ ডিসেম্বর ভুটান এবং ভারত উভয় দেশই একদিনে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

দখলদারিত্বের উচ্ছেদ পুরোদমে চলতে থাকে যৌথবাহিনির অভিযানে। এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ এর একটি ছবি আমরা দেখতে পাই।

ছবিতে একটি কাগজে পাকিস্তানি বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট নিয়াজী স্বাক্ষর করছেন।

এই কাগজটি মূলত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিল।

এই কাগজে যা লেখা ছিল তার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানের সকল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণে সম্মত হলো। পাকিস্তানের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীসহ সব আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আত্মসমর্পণ প্রযোজ্য হবে। এই বাহিনীগুলো যে যেখানে আছে, সেখান থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সবচেয়ে নিকটস্থ সেনাদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীন হবে। নির্দেশ না মানলে তা আত্মসমর্পণের শর্তের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং তার প্রেক্ষিতে যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর অর্থ অথবা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো সংশয় দেখা দিলে, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছেন এবং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুবিধার অঙ্গীকার করছেন। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের সুরক্ষাও দেওয়া হবে।"

স্বাক্ষর করেনঃ

ক) জগজিৎ সিং অরোরা

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ

পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলা দেশ যৌথ বাহিনী

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

এবং

খ) আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল

সামরিক আইন প্রশাসক অঞ্চল বি

অধিনায়ক পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এটি সম্পূর্ণ আজগুবি। কারন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ শে মার্চ। আর ১৬ ডিসেম্বর এর বিজয় ভারত -পাকিস্তান যুদ্ধে নয় এটি ছিল প্রথমে মুক্তিবাহিনী বনাম পাকিস্তানি বাহিনী এবং পরে যৌথবাহিনি বনাম পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ।

ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে নি বরং আত্মসমর্পণ করেছে যৌথ বাহিনী প্রধানের কাছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

- বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম ও স্বাধীনতা দিবস - ২৬ শে মার্চ

- দখলদার হানাদার বাহিনিকে উৎখাত করে, বিজয় দিবস -১৬ ডিসেম্বর

করোনা সংক্রমিত ভবিষ্যৎ গল্প

দীর্ঘদিনের ছুটি, আমার জেদ এর কারনে তোমার দাদা-দাদি আমাকে নিয়ে কক্সবাজার ঘুরতে গিয়েছিলেন।

তখন নভেল করোনা ভাইরাস এর কারনে বৈশ্বিক মহামারী সৃষ্টি হয়েছিলো।

দূর্ভাগ্যবশত তোমার দাদা আমাকে নিয়ে কক্সবাজার ঘুরতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হোন এবং হাসপাতালে আইসিউ সংকটের কারনে সঠিক চিকিৎসার অভাবে মারা যান।

.

তোমার দাদার মৃত্যুতে তোমার দাদি অনেক মর্মাহত হোন, এবং এই শোকে অল্প দিনের মধ্যেই উনিও মারা যান!

যদি আমি ঐদিন ঘুরতে যাওয়ার জেদ না করতাম তবে.....

.

সামিউল এর বাবা জনাব তৌসিফ শাহরিয়ার তার ছেলে সামিউলকে নিজের অতীত জীবনের গল্প বলতে গিয়ে এভাবেই ডুকরে কেঁদে উঠেন।

নিজের বাবা-মায়ের মৃত্যুর জন্য সেই দিনের কিশোর তৌসিফ আজ ২৫ বছর পরেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

.

আপনার ভবিষ্যৎ গল্প এমনিভাবে করোনা সংক্রমিত না হোক।

ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং বয়স্কদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

২০১৯

স্মৃতিময় স্কুল জীবন

খুব করে একবার পেছনে যেতে ইচ্ছে হয়!

খুব করে একবার হসউবির দিনগুলোতে যেতে ইচ্ছে হয়!

খুব করে ইচ্ছে হয় গাফফার স্যারকে একদিকে দেখে আরেকদিকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় বারান্দায় বোতল দিয়ে ফুটবল খেলতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় প্রাত্যহিক সমাবেশ না করে অন্য কোনো জায়গায় সবাই একসাথে লুকিয়ে থাকতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় সমাবেশে শপথ পাঠের সময় প্রতিটি বাক্যের শেষে না যুক্ত করতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় প্রথম ক্লাসের পরে স্কাউট,বিএনসিসি,ব্যান্ড, প্রোগ্রামের কথা বলে ক্লাস কামাই করতে!

খুব ইচ্ছে হয় কাইয়ুম স্যারের হাতে বয়ান খেতে!

খুব ইচ্ছে হয় নিহার স্যারের ক্লাসে দেরিতে যাওয়ার অপরাধে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে!

খুব ইচ্ছে হয় মইন স্যারের ক্লাসে ক্লাস পলাতকের শাস্তি পেতে!

খুব ইচ্ছে হয় প্রবাস স্যারের হাতে ডাস্টারের বারি খেতে!

খুব ইচ্ছে হয় আনজব আলী স্যারের হাতে অপমানিত হতে!

খুব ইচ্ছে হয় কায়সায় স্যারে সেই বিখ্যাত মাথা নিচু করে পিঠে থাপড়া খেতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় গোপাল স্যারের কাছে নিজের রোল বানান করে বলতে!

খুব ইচ্ছে হয় শংকর স্যারের সাথে সেলফি তুলতে!

খুব ইচ্ছে হয় নজরুল স্যারের কড়াকড়ি করা বাংলা ক্লাসগুলো ফিরে পেতে!

খুব ইচ্ছে হয় কাশেম স্যারের সাথে ফাইজলামি করতে!

খুব ইচ্ছে হয় সত্যজিৎ স্যারের হাতে গালে চড় খেতে!

খুব ইচ্ছে হয় জামিনা ম্যাডামের সেই জালি বেতের মার খেতে!

খুব ইচ্ছে হয় বিভাস স্যারের স্কেলের দুই কেজি ওজনের বারি খেতে!

খুব ইচ্ছে হয় আক্তার স্যারের সবাইকে সালাম দেওয়া লাগবে না, হাত নিচে রাখ উক্তিগুলো শুনতে!

খুব ইচ্ছে হয় গিয়াস স্যারের বাবারে বাবা তরা জ্বালাইস না কথাটা শুনতে!

খুব ইচ্ছে হয় আব্দুর রহিম স্যারের বুকের পাঠাটা লাগিয়ে নাও কথাটা শুনতে!

খুব ইচ্ছে হয় সামসুর রহমান স্যারের ক্লাসে ২০ টা অবজেকটিভ লিখতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় পরীক্ষার হলে জামিনা ম্যাডাম, অলকা ম্যাডামের আগমনের জন্য দোয়া করতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় স্কাউট ডেন, বিএনসিসি প্লাটুনে ক্লাস টাইমে বসে আড্ডা দিতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় স্কাউটের কমান্ড দিতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় জুনিয়রদের শাস্তি দিতে!

খুব করে ২ টা টিফিন খেতে ইচ্ছে হয়!

খুব করে ইচ্ছে হয় টাউন হলে আড্ডা দিতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় স্কুল কামাই করে, ছুটির পরে দুই গ্রুপে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় সাদা শার্টে লাল রঙ লাগাতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় সেই সবাই একসাথে স্কুল কামাই করতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় লোকমান ভাই,জিতু ভাই,তারেক ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় যেকোনো টপিক নিয়ে আন্দোলন করে মেইন রোড বন্ধ করে দিতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় আমার স্কুল নিয়ে বিকেজেসির বোনদের সাথে তর্ক করতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় ক্যাবিনেট নির্বাচন, বিভিন্ন প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে ঝামেলা করতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় সবাই মিলে একজনকে পচাইতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় বন্ধুদের বাবার নাম ধরে ডাকতে!

খুব করে ইচ্ছে হয় প্রিয় বন্ধুদের সাথে ক্লাস করতে,

খুব করে ইচ্ছে হয় স্কুল লাইফটা ফিরে পেতে!

বুক রিভিউঃ ক্রাচের কর্নেল - শাহাদুজ্জামান

পৃষ্ঠাঃ- ৩৪২

প্রধান চরিত্রঃ- বীর উত্তম কর্নেল আবু তাহের।

বইটি আমি পড়া শেষ করি ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮। সেই মুহূর্তে রিভিউ লেখার অবস্থায় ছিলাম না। নির্বাক হয়ে যাই। আমি জানিনা কিভাবে বলতে হবে এই মানুষের কথা। লেখক এতো আবেগ মিশিয়ে লিখেছেন যে মাঝেমাঝে চোখে জল এসেছে, কখনো গভীরভাবে তাহেরের মানসিকতা বুঝার চেষ্টা করেছি। শুধু বইয়ের শেষের দিকে একটি কাহিনি বর্ননা করলাম।

কর্নেল তাহেরকে জানানো হয়, আজ তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হবে। তিনি সে সংবাদ গ্রহণ করেন এবং সংবাদবাহকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি তাঁর খাবার শেষ করেন। পরে একজন মৌলভি তাঁকে তাঁর পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন।

তাহের বললেন,

...'তোমাদের সমাজের পাপাচার আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমি কখনো কোনো পাপকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আমি নিষ্পাপ। তুমি এখন যেতে পারো, আমি ঘুমাবো।' তিনি একেবারে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলেন। রাত ৩টার দিকে তাঁকে জাগানো হলো। সময় জেনে নিয়ে তিনি দাঁত মাজলেন। তারপর শেভ করে গোসল করলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলে তিনি বললেন, 'আমি আমার পবিত্র শরীরে তোমাদের হাত লাগাতে চাই না।' তিনি নিজেই তাঁর কৃত্রিম পা খানি লাগিয়ে প্যান্ট-জুতা পরে নিলেন। চমৎকার একটা শার্ট পরলেন। ঘড়িটি হাতে দিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে নিলেন। তারপর উপস্থিত সবার সামনে আম খেলেন, চা খেলেন এবং সিগারেট টানলেন। সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

'তোমরা এমন মনমরা হয়ে পড়েছো কেন?

মৃত্যুর চেহারায় আমি হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম।

মৃত্যু আমাকে পরাভূত করতে পারে না।'

তাঁর কোনো ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

'আমার মৃত্যুর বদলে আমি সাধারণ মানুষের শান্তি কামনা করছি।'

এরপর ফাঁসির মঞ্চে আবৃত্তি করেন সেই কবিতা-

‘জন্মেছি, সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে কাঁপিয়ে দিলাম।

জন্মেছি, তোদের শোষণের হাত দুটো ভাঙ্গব বলে ভেঙ্গে দিলাম।

জন্মেছি, মৃত্যুকে পরাজিত করব বলে করেই গেলাম।

জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর রেখে গেলাম।

পাথরের নিচে, শোষক আর শাসকের কবর দিলাম।

পৃথিবী অবশেষে এবারের মতো বিদায় নিলাম...'

.

অতঃপর মিথ্যে মামলায় উনার ফাসি কার্যকর করা হয়।

বইটিতে বর্নিত আছে তাহেরের বিপ্লবী চেতনা, তাহেরে পরিবারের বর্ননা, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের বর্ণনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের বর্ননা, তাহের-লুৎফার পবিত্র ভালোবাসার বর্ণনা, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জাতির পিতা হত্যা,খালেদ মোশাররফ এর অভ্যুত্থান, কর্নেল তাহেরের সিপাহী বিপ্লব, মেজর জিয়াকে গৃহবন্দী থেকে মুক্ত করা, কর্নেল তাহেরের বিচার প্রক্রিয়া প্রভৃতি।

আমার পড়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা বই। যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। অন্ততপক্ষে আপনার সময়ের অপচয় হবে না।

বুক রিভিউঃ নন্দিত নরকে - হুমায়ূন আহমেদ

মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামি দেখতে পায়। সে নোংরামির বড় শিকার তারাই। তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

বইটি হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রথম উপন্যাস।

বইটিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের হাসি,কান্না, মায়ের ভালোবাসা, পিতার নীরব ভালোবাসা ও শাসন,ভাই- বোনের খুনসুটি ও ভালোবাসা খুব সুন্দর ভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক নিজেই ছিলেন গল্পকথক।

পিতার বন্ধু গৃহশিক্ষক মাষ্টারচাচার দ্বারা মানসিক বিকারগ্রস্থ এক কিশোরীর গর্ভধারনের পর তাকে এবোরশন করানোর সময় তার মৃত্যু এবং পরবর্তীতে সৎ ভাই মন্টুর দ্বারা মাষ্টারচাচার খুনের ঘটনা লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ অংশে মন্টুর দৃঢ়চেতা মনোভাব ও সাহসিকতা উপন্যাসটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

বইটি পড়তে বসেছিলাম ১০ পৃষ্টা শেষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু কখন যে বইয়ে হারিয়ে গেলাম এবং বইটি শেষ করে ফেললাম সেই খেয়াল ছিল না। বইটি আপদমস্তক আমার ভালো লেগেছে। হুমায়ূন আহমেদ স্যার গোটা উপন্যাসটি লিখেছেন এক অদ্ভুত রহস্য মন্ডিত করে। গল্পের শেষে পাঠকের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর খুজে পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গল্পে কোথাও এসব প্রশ্নের উত্তর খোলাশা করেন নি। আর এখানেই লেখকের সার্থকতা।

মাত্র ৬৩ পৃষ্টার বইটি পড়ার আমন্ত্রন রইল।

কবিতাঃ দেবী

মোঃ মুশফিকুর রহমান

দেবী তুমি 'সাদা' না 'কালো'?

আমার রক্ত লাল।

দেবী তুমি 'স্বদেশী' না 'বিদেশিনী'?

আমার রক্ত লাল।

দেবী তুমি 'ব্রাহ্মন' না 'শূদ্র'?

আমি মানুষ।

দেবী তুমি 'হিন্দু' না 'মুসলিম'?

আমি মানুষ।

মুসলিম বলবে 'আমি মানুষ',

হিন্দু বলবে 'আমি মানুষ',

ধনবান বলবে 'আমি মানুষ',

হতদরিদ্র বলবে 'আমি মানুষ',

শ্বেতাঙ্গ বলবে 'আমি মানুষ',

কৃষ্ণাঙ্গ বলবে 'আমি মানুষ',

আমি মানুষ,

আমি মানুষ,

আমি মানুষ।

আমি সবার মতোই

লাল রক্ত-মাংসের মানুষ।

২০১৮

কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ব্যক্তিগত মতামত

কোটা তো একজন প্রতিবন্ধী কিংবা সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া সব কোটা উঠিয়ে দেয়া উচিত। প্রতিবন্ধীদের শুধু এই কারনে কোটা দেয়া যায় যে, তারা প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা ফেস করে। কিন্তু নারী কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারীরা সাধারন শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা ফেস করছে না। তাই চাকরির জন্য যুদ্ধটা এদের সাথে সাধারনের সমানে সমান হওয়া উচিত। কেউ যদি, পদ পেতে চায়, সে যোগ্যতা দিয়ে পাক। সবাই আমরা ভাত খাই, একই কাগজে লিখি, একই বই পড়ি, পড়ার সুযোগ গড়পড়তা আমরা সবাই সমান পেয়েছি। এমতাবস্থায় একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে মেধাতালিকার ১৫০০ তম কাউকে বাদ দিয়ে ৫৬৮০ তম কাউকে পদ দিয়ে দেয়া অনেক বেশী আনফেয়ার। সরকারী চাকরি একটি গুরু দায়িত্ব। ভোগের বস্তু নয় যে অমুক কে আমরা ভোগ করতে দিলাম। সরকারী কর্তাদের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে একটি দেশ চলবে। নিশ্চই দেশ চালানোর জন্য ৬০০০তম র চাইতে ১৫০০তম অধিক যোগ্য। যদি এভাবে অযোগ্যদের আমরা দেশের দায়িত্বে বসিয়ে রাখি তাহলে অচিরেই দেশ পঙ্গু হয়ে যাবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঃ ৯৯৯ বা জরুরী সেবা

★

১.ঘটনাটি সাইফুর রহমান টাউন হল প্রাঙ্গনের রাফি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এ। গতবছর ঈদুল আযহার দিনে সবাই যখন গরু কাটা নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমি আর Samnun Shad বাসা থেকে বের হয়ে হবিগঞ্জ সাইফুর রহমান টাউন হল প্রাঙ্গনে এলাম। এসেই দেখতে পেলাম রাফি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর ভিতরে থেকে প্রচুর পরিমানে ধোয়া বের হচ্ছে। প্রথমে আন্দাজ করতে পারছিলাম না যে ধোয়াটা ঠিক আসছে কোথা থেকে বা ধোয়াটা কিসের আগুন না অন্য কিছু। ঈদের দিন বিধায় টাউনহল মার্কেট বন্ধ। ভিতরে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। কুরবানি ঈদের দিন রাস্তায় তেমন মানুষজন ও নেই। যারা আছে সবাই কর্মব্যস্ত। কারো এদিকে থাকানোর কোনো উপায় নেই। একটু পরপর এক দুটি টমটম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তখনই সাত-পাচ না ভেবে রাফি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর বিলবোর্ড থেকে কর্নেল কিস্মত আলী চাচার নাম্বার এনে তাকে জলদি কল দিলাম। উনিও কুরবানির কাজে ব্যস্ত। ৪-৫ টা কল দেওয়ার পর উনি কল রিসিভ করলেন। তারপর উনাকে বিবরণ বলার পর উনি জলদি উনার দোকানের কর্মচারিকে নিয়ে দৌড়ে এলেন। কিন্তু চাবি আনলেন না। তারপর আবার দোকানের কর্মচারি দৌড়ে গেল চাবি আনতে। চাবি এনে খুলার পর দেখা গেল দোকানের ভিতরে আগুন। উনার অতি স্বাদের Pulsar 150 দোকানের ভিতরেই ছিল। চারজনে মিলে জলদি এটাকে টেনে বের করলাম। এতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে বলে বুজানো যাবে না। আর একটু দেরি হলেই হয়তো ব্লাস্ট হয়ে উড়ে যেত সাথে বড় দূর্ঘটনাও ঘটে যেত। উনারা দেখলাম অতি ব্যস্ত দোকানের জিনিসপত্র সরাতে। আগুন নিভানোর প্রতি কারো দৃষ্টি নেই। ইতিমধ্যে আগুন বিশাল আকার ধারন করেছে। পাশের দোকানেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আমরা মানুষ মাত্র ৪ জন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস এর নাম্বারও নেই। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। জলদি ৯৯৯ (পরিক্ষামূলক ভাবে তখন চালু ছিল) এ কল দিলাম। তারা ঢাকা থেকে হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এ ট্রান্সফার করে দিল।

বিবরন বলে দেওয়ার কিচ্ছুক্ষণ এর ভিতরেই ফায়ার সার্ভিস উপস্থিত। এর ভিতরেই টাউনহল এর ভিতরের যত দোকান আছে সব দোকানের বিলবোর্ড থেকে মালিকদের নাম্বার সংগ্রহ করে কল দিলাম। তারপর সকলে মিলে আগুন নিভানো হলো।তারপর চলে গেলাম Rabin ভাইয়ের বাড়িতে। আর কর্নেল চাচা খুশি হয়ে দোকান আবার তৈরির পর আমাদের খাওয়ালেন। 😋😋

★

২.ঘটনাটি কামড়াপুর ব্রিজ এর পাশে। হবিগঞ্জবাসীর নিশ্চয়ই গত বছর রমজানের সেই দিনটির কথা মনে আছে? যে দিন খোয়াই নদীর পানি বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছিল। শহরের ভিতরে নদী ভাঙ্গনের গুজবপ্রচার হয়েছিল। সারা শহরবাসী আতঙ্কে ছিল। রাত্রে কারো ঘুম হয় নি। অনেক স্বেচ্ছাসেবী ভাইয়েরা রাত্রে জেগে নদী পাহাড়া দিয়েছেন। কোনো দিকের বাধে ফাটল দেখা দিলে তা বালুর বস্তা ফেলে রুখে দিয়েছেন। সেই রাত্রে ৯ টার দিকে হয়তো আমি আর আমার একবন্ধু টাউনহল থেকে হেটে হেটে গেলাম চৌধুরীবাজার নদীর পানি পরিদর্শনে। তারপর চৌধুরীবাজার থেকে গেলাম কামড়াপুর ব্রীজ এ। ইতিমধ্যে নদীর পানি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব বাড়িঘর নদীর বাধে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো ডুবে যাচ্ছে। স্থানীয় ভাবে ভিতরে থাকা মানুষদের বের করে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছিল। জলদি আবার কল দিলাম ৯৯৯ এ (তখনো পরিক্ষামূলকভাবে চালু রয়েছে)। ঢাকা অফিস থেকে হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস,হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় ট্রান্সফার করে দিল। কিচ্ছুক্ষনের মধ্যেই পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস একসাথে এসে উপস্থিত। ফায়ার সার্ভিস এর এক কর্মকর্তা এসে কথা বললেন আমার সাথে। আমিই কল দিয়েছিলাম কি না? তারপর তারা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করল।

★

৩.ঘটনাটি এবছর শবে বরাত এর রাত্রে। ১১.৩০ এর দিকে চৌধুরী বাজার থেকে বাসায় ফিরছিলাম। রাস্তাঘাটে কোনো টমটম নেই। তাই বাধ্য হয়ে হেটেই রাস্তা চলছিলাম। যেহেতু শবে বরাতের রাত তাই রাস্তাঘাটে অনেক মানুষ ছিল। হেটে হেটে যখন হবিগঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজের সামনে এলাম তখন দেখলাম অনেকগুলো মানুষের ঝটলা। বুজলাম কোনো গোলমাল। উৎসাহী হয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটি রিক্সা ও রিকশাওয়ালাকে ঘিরে সবাই দাঁড়ানো। রিক্সাওয়ালা লোকটি তখন রিক্সার মধ্যে কাতরাচ্ছে। কোনো কথা বলার অবস্থায় নেই। কিন্তু মানুষগুলো যে যার যার মত দেখে চলে যাচ্ছে। অনেকে অনেক বাজে মন্তব্য করছে। আমি একা। কি করব কিছু বুজে উটতে পারছিলাম না। লোকটি ছিনতাইকারী, কিডনাপার ও হতে পারে। তৎক্ষনাৎ ৯৯৯ জরুরি সেবায় কল দিলাম (তখন কিন্তু পরিক্ষামূলকভাবে না আনুষ্ঠানিকভাবে চালু জরুরি সেবা)। ওরা জিজ্ঞেস করল আমি ঘটনাস্থলে আছি কি না? বললাম হ্যা, আমি ঘটনাস্থলে। বিস্তারিত জানার পর উনারা বললেন যে দুঃখিত উনি অজ্ঞান নয় তাই আমরা কিছু করতে পারব না। কি করব কিছু বুজে উটতে পারছিলাম না। পকেটে ছিল আমার টমটম ভাড়া বাবদ ১০ টাকা। কিছু সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ভাবলাম একটু এগিয়ে রাজনাগরের মুখে গিয়ে দেখি কোনো বড় ভাইকে পাই কি না! কিন্তু ১০ হাত এগুতেই পেয়ে যাই ছোট ভাই Raj ও Plabon হেটে হেটে যাচ্ছে। ওদেরকে বলার পর ওরা উৎসাহী হয়ে আমার সাথে ঘটনাস্থলে আসে। গিয়ে আলোচনা করে ঠিক করলাম হাসপাতাল নিয়ে যাব ওনাকে। কিন্তু সঙ্গে ছিল উনার রিক্সা। যার তালাও নেই তার কাছে। কিচ্ছুক্ষন দাড়ানোর পর কিছু বড়/ছোট ভাইদের পাই। ওরা রিক্সাটিকে তৎক্ষনাৎ স্কুলের ভেতর নিয়ে যায়। আমি, রাজ,প্লাবন সিএনজি নিয়ে ছুটি হাসপাতালের দিকে। পথিমধ্যে রাজ তার বাসার সামনে সিএনজি আটকিয়ে দৌড়ে যায় টাকা আনতে কারন আমাদের সবার পকেট প্রায় অর্থশুন্য। হাসপাতালের সামনে যাওয়ার পর আলমগির, মাহি সহ কিছু ছোটভাইকে পাই। ওদের নিয়ে যাই হাসপাতালের ভেতর। যে সিএনজিওয়ালা আমাদের নিয়ে হাসপাতাল এসেছিলেন উনি কোনো ভাড়া নেননি। তারপর হাসপাতালে চেকঅাপ

করিয়ে কর্তব্যরত ডাক্তার উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। ডাক্তারের দেওয়া প্রেকসিপশন নিয়ে রাজ ছুটে চলে ওষুধ আনতে। আমি আর প্লাবন উনার পরিচয় জানতে ব্যাস্ত হয়ে গেলাম। উনি জানালেন উনি ৩ নং তেগরিয়া ইউনিয়ন এর চরগাও এলাকার উত্তর পাড়ার নিবাসী। প্লাবন এর আব্বু ৩ নং তেগরিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান। তারপর উনার ফ্যামিলির সাথে কথা বলে উনাকে হাসপাতাল রেখে আসলাম। আমি,রাজ,প্লাবন রিক্সা দিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উনার রিক্সার খোজ করলাম। তারপর রাজ রিক্সা চালিয়ে আর আমি ধাক্কা দিয়ে,পেসেঞ্জার হয়ে রাজনাগর আড্ডা ফাস্টফুড এর সামনে আসলাম। তখন স্থানীয় কমিশনার মজনু চাচ্চুকে কল দিয়ে রিক্সা রাজের বাসায় রেখে আসলাম। উনি উনার মমতা দিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। রাত্র ২ টায় বাসায় ফিরলাম। পরদিন সকালে আমি ও রাজ গিয়ে উনাকে দেখে আসলাম। তারপরে উনি সুস্থ হয়ে উনার রিক্সা নিয়ে গেলেন। উনার কিডনিতে পাথর দেখা দিয়েছিল।

★ পরিশেষে ৯৯৯ বা জরুরি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি সেবা। ২৪ ঘন্টা যেকোনো বিপদে উনাদেরকে কল করতে পারেন। এম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস,পুলিশ সেবার জন্য। আর হ্যা চার্জ ফ্রি। ★

আমার আলমা ম্যাটার হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

আজকের লেখাটা আমার ভ্যালেন্টাইন "হসউবি" কে নিয়ে। আপনি যদি হবিগঞ্জের সন্তান হয়ে থাকেন আর 'হসউবি' তে পড়ার সুযোগ না পেয়ে থাকেন তবে মনে করবেন যে জীবনের অন্যতম একটি সুযোগ আপনার হাত ফসকে গেল। স্কুল লাইফের আসল মজাটাই আপনি মিস করে গেলেন। হ্যা, আমি বাড়িয়ে বাড়িয়েই বলছি। কারন সবচেয়ে সুন্দর স্কুল ক্যাম্পাস হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে হবিগঞ্জে ঘুরতে যাব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো জায়গা কোনটা ভালো হবে?

আমি নির্দ্বিধায় সাজেস্ট করব হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। পুকুর, গাছপালা,প্রকৃতির সৌন্দর্য, পাখিদের কিঁচিমিঁচির শব্দে যে কাউকেই করে তোলবে মুহুর্তের মধ্যেই ব্যাকুল। দর্শনার্থীদের জন্যও হয়ে উঠে উপভোগ্য। যা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেনা।। পুকুরের পাড়ে রয়েছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রজাতির বিশাল বড় বড় পুরোনো বৃক্ষ। বৃক্ষ গুলোতে সার্বক্ষনিক থাকে কয়েক শত টিয়াসহ নানা প্রজাতির পাখি। পাখি গুলোর কলকাকলিতে পুকুরের আশপাশ সবসময় মুখরিত থাকে। এখানে তৈরি করা হয়েছে পাখিদের নিরাপদ বাসস্থান। পুকুরের পানিতে দেখা মিলে লাল শাপলা ফুলের। বসার জন্য শেড সহ নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো নয়নভিরাম স্কুল ক্যাম্পাস। যা যে কাউকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। স্কুলের ভেতর আবাসিক এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন ফলগাছ।স্কুলটি হবিগঞ্জ শহরের টাউন হল রোডের পাঁশে ২৯.১৮ একর (সবচেয়ে বড় স্কুল ক্যাম্পাস) বিশিষ্ট সুবিশাল জায়গা নিয়ে অবস্থিত। ৩য় থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত ১৬০০ (প্রায়) মেধাবী ছাত্র নিয়ে দুই শিফটে (ডে,মর্নিং) স্কুলটি পরিচালিত। প্রতিবছর বিপুল পরিমান ছাত্রদের থেকে ৩য় ও ৬ ষ্ঠ শ্রেনীতে ভর্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মোট ২৪০ ছাত্র ভর্তি করে থাকে। বিদ্যালয়ের রেজাল্ট বরাবরই ঈর্ষনীয়। হবিগঞ্জ জেলায় সবসময় ১ম স্থান অর্জন করে। সম্পূর্ন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাধীন আমাদের এত বড় ক্যাম্পাস। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশ সেরাদের অন্যতম হসউবি। বিসিএস সহ অন্যান্য সকল জবের ক্ষেত্রে হসউবির স্টুডেন্টদের রয়েছে দারুন সাফল্য। গণমাধ্যম, আমলাতন্ত্র, রাজনীতি, খেলাধুলা, বুয়েট,মেডিকেল এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে হসউবির শিক্ষার্থীরা পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেননা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং অতিথি পাখির অভয়ারণ্য হসউবির এক পার্থিব স্বর্গের নাম। প্রতিদিন, বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাত্যহিক কার্যক্রমের শুরু হয়। সামাবেশের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সমাবেশ তাতে সম্মান প্রদর্শন করে। সমাবেশের শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির সেবা করার শপথ নেয়। সমাবেশ শেষে ক্লাস শুরু হয় স্ব স্ব শ্রেণীকক্ষে। শ্রেণী কার্যক্রম দুই শিফটে, রুটিন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম হলো সাদা রঙের শার্টপ্যান্ট। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে সপ্তাহের পাঁচদিন টিফিন দেয়া হয়, এই ফান্ড পরিচালনার দায়িত্ব থাকে একজন শিক্ষকের উপর। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ বিদ্যালয়ের রয়েছে তিনটি ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞানাগার। এছাড়া রয়েছে প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি বই নিয়ে গঠিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

এই বিদ্যালয়ে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রাম ১৯৯৫ সনে শুরু হয়। ১৯৯৫ সনে অত্র বিদ্যালয় টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে প্রথম বর্ষে ৫৩জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তখন থেকে বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম নিয়মিত অব্যাহত আছে।বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, মানবিক, ও ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি শাখা চালু রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রতিবার বার্ষিক পরীক্ষা শেষে অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কাজে সহায়তার লক্ষ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য চালু রয়েছে বিশেষ কোচিং কার্যক্রম।সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার বাইরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন- সাধারণ জ্ঞান, উপস্থিত ও নির্ধারিত বক্তৃতা, বিতর্ক, সংগীত, আবৃত্তি, হামদ্, নাত-এ-রাসুল ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

করে থাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রতি বছরই বিদ্যালয়ে বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রগণ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবছর সরস্বতী পূজাও উদযাপন করে আসছে। বিদ্যালয়ের রয়েছে বিএনসিসি, স্কাউট, কাব ও ব্যান্ডদল। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ অনুষ্ঠানে স্কাউটদল অংশগ্রহণ করে থাকে তারা। অত্র বিদ্যালয়ের স্কাউটরা প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গৌরবোজ্জ্বল সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের বিএনসিসি কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। এই প্লাটুনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ক্যাডেটদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমাদের গর্বের বস্তু আমাদের সাদা পোশাক। স্কুলের ক্যাম্পাস,স্কুলের বারান্দা,স্কুলের পরিবেশ যেকোনো খারাপ ছাত্রকেও পরিবর্তন করে দেয়।

স্কুলের শিক্ষকদের কথা না বললেই নয়। আমাদের শিক্ষকবৃন্দ আমাদের সাথে সময়ে কঠোর, আবার সময়ে বন্ধুর মতোই আচরন করেন। শিক্ষক মহোদয়গন আমাদের প্রতি কেমন আচরন করেন তা বুজা যায় তখনই যখন দেখা যায় যখন শিক্ষকবৃন্দের বিদায় অনুষ্ঠানে ছাত্রদের চোখের অশ্রু দেখেই।

বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪ র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ভাইয়েরা সত্যি কথা বলতে গেলে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি উনারা আমাদের নিজের আপন ছোট ভাইয়ের মতোই আগলে রেখেছেন। আমরাই আইজেন সারা দেশে রানারআপ,আমরাই সারা দেশে বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন। আমাদের ছাত্ররাই জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সারাদেশব্যাপী চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে।

বাংলাদেশের যেকোনো জায়াগায় গর্বের সহিত বুক ফুলিয়ে মাথা উচু করে বলতে পারি যে আমি হসউবির ছাত্র।

খুব বেশি মিস করি প্রানের বিদ্যাপীঠ হসউবিকে।

মিস করি টাউনহলের আড্ডা,বোতলের ফুটবল খেলা,স্কুল পালানো,স্কাউট সহ সব কিছুকে।

মিস করি সাদা শার্ট-প্যান্ট,সহপাঠীবৃন্দ,শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়বৃন্দ সহ সবকিছুকে।

পরিশেষে হসউবিই সেরা।